যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

দি বুক সোসাইটি

২২১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মৌচাক-সম্রাট
শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র সরকার
সমীপে

এই বইয়ে আছে

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন

এবং

স্যাঙাতের সাক্ষাৎ

ও

বিপিনের পরিচয়-সূত্র

আর অসংখ্য ছবি

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর যা বোমার ধাক্কা! মাদ্রিদ্ এবং তার আশে পাশে খুব কম বাড়ীঘরই আস্ত ছিল। ঈশান্ কোণে মেঘের আবির্ভাব যেমন ঝড়ের পূর্ব্বাভাস তেমনি আকাশের যে-কোনো কোণে এরোপ্লেন-দর্শন্ মানেই বোমার অধঃপতন! হয় তারা সশব্দে পড়বে এসে মাথায় কিম্বা, দয়া করে নিতান্ত মাথায় না পড়লেও বাড়ীর হাতায় তো বটেই! অবিশ্যি, বোমার ছোঁয়াচে বাঁচা খুবই শক্ত, কিন্তু মাথা বাঁচিয়ে বাড়ীর ছাদে পড়লেই বা এমন কি সান্ত্বনা? বাড়ী ঘর চাপা পড়লেই কি মানুষ বাঁচে?

এত ধূমধাড়াক্কা হর্ষবর্দ্ধনের পছন্দ নয়। এতটা বাড়াবাড়ি গোবর্দ্ধনেরও ভালো লাগছিল না। তা ছাড়া মেঘেদের একটা দস্তুর আছে, সাধারণতঃ ঈশান্ কোণ থেকেই তারা দেখা দেয়, এই কারণে তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সহজ,

হর্ষবর্দ্ধনের ধারণা। এমনকি, ঈশান্ কোণ যে ঠিক কোন্ দিকটা আদৌ না জান্‌লেও তাঁদের চলে যায়—

আকাশের যে-কোণেই হোক্, কি মাঝখানেই হোক্, মেঘ দেখেছ কি আর নৌকা চেপ না! এই ভাবেই তাঁরা আকাশের মেঘ আর জলের নৌকার—দুয়ে মিলে জলমগ্নতার—হাত থেকে আত্মরক্ষা করে এসেছেন চিরকাল।

কিন্তু এরোপ্লেন্‌গুলোর কোনো দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই, যে-কোনো কোণ থেকেই এসে পড়ে অকস্মাৎ। এসে পড়্‌লেই হোলো। তারপর সাম্‌লাও ঠ্যালা!

বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌.........ঐ আস্‌ছে বোমারু প্লেন্!

বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌...ব্রান্‌...!

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাত!

হর্ষবর্দ্ধন মুখ বেঁকিয়ে বলেন—"নাঃ, বোম্বাই গিয়ে ভালো করিনি গোব্‌রা!"

"কেন দাদা?"

"কেন আবার! জলেই এসে জল বাধে—দেখছিস্ না!"

গোব্‌রার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-শক্তি স্বভাবতঃই একটু কম। সে কিছুই দেখতে পায় না!

"দেখচিস্ নে বোমার ধুম্? বোমাকে এরা বলে কী শুনি? কী বলে ইংরাজীতে? বম্ব্! আর বম্ব্‌কে একবার ডেকে দ্যাখ, তা হলেই টের পাবি।"

গোবর্দ্ধন তবু বুঝতে পারে না। বম্ব্‌কে আবার ডাকবে কি? ও তো না ডাক্‌তেই দেখা দেয়—ছেলের হাতে খাবারের ঠোঙা থাক্‌লে চিল্‌দের মতই ওদের স্বভাব অনেকটা। ওকে আবার ডাক্‌তে হয় নাকি?

"আস্ত একটা হাঁদা তুই মোদ্দাৎ!" হর্ষবর্দ্ধন বলেন এবার "বম্ব্‌কে ডাকা—এই সামান্য কাজটা পারছিস্‌নে? আকাশের দিকে তাকাচ্ছিস্ কি হাঁ করে? বম্ব আয় বম্ব আয়, বোমাকে ডাকা তো এই? তাহলেই হোলো বম্বায়! সন্ধি করেই হোলো। স্বরসন্ধি।" মৃদু মধুর হাস্যে ভরে ওঠে ওঁর মুখ: "আর বম্বায় যা, বোম্বাইও তা!"

দাদার বিচক্ষণতায় গোবর্দ্ধন মূহ্যমান হয়ে পড়ে। ওর মুখে কথাই সরে না।

"না বোম্বাই যাই না, বোমার পাল্লায় এসে পড়ি।"

"সে কথা ঠিক দাদা!" গোবর্দ্ধন সায় দেয় এতক্ষণে।

তারপর ওরা গুম্ হয়ে থাকে। বহুক্ষণ বাদে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় গোব্‌রার: "র‍্যাট্‌ সাহেব বল্ল যে ইস্‌পেনের সবই ফরেষ্ট্‌! তা ফরেস্‌ট্‌ কই ইস্‌পেনে? কেবলি তো সহর দেখ্‌ছি।"

হর্ষবর্দ্ধন হুম্‌কি দ্যায়—"এখন তুই কী দেখবি জঙ্গলের? জঙ্গলের কী হয়েছে এখন?"

"কেন? এত বড়ো ইস্‌পেনে, জঙ্গল থাকলে তা চোখে পড়বে না মানুষের? জঙ্গল তো আর জীবাণু নয় যে লুকিয়ে

থাকবে? জীবাণুও নয়, ভগবানও না,—তবে? গোবর্দ্ধন একটু অবাক্ই হয়।

"বাঃ, এই ত এখন সহরগুলো ভাঙছে সবে! এর মধ্যেই
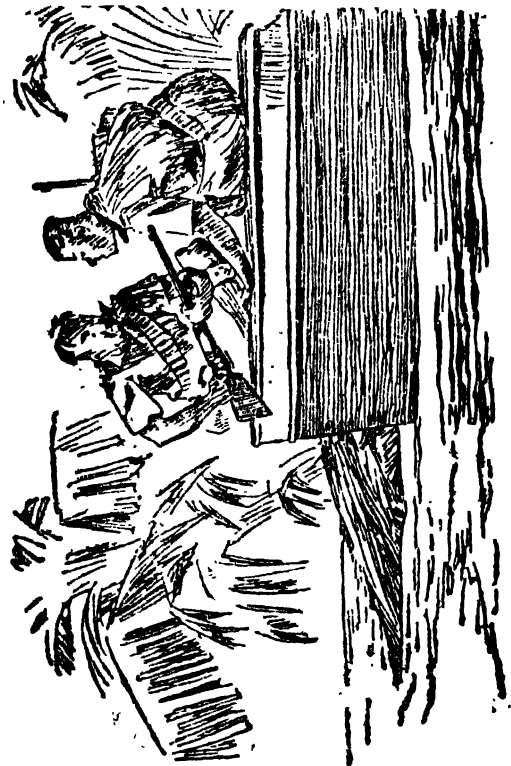
জঙ্গল কই? জঙ্গল তো দেখছি না দাদা!

জঙ্গল? আগে সহরগুলো সেরে ফেলুক, মানুষগুলোকে সাবাড় করুক, তারপর আপনি জঙ্গল হবে, কারুকে দেখতে

শুন্‌তে হবে না। এত বড় ইস্‌পেন্‌, এখন কেবল লম্বায় আর চওড়াতেই বড়ো, তখন উচ্চতাতেও বড়ো হবে।"

"তা হলে র‍্যাটসাহেবের বেশ দূর-দৃষ্টি আছে, কি বলো দাদা?"

"থাক্‌বে না? কত বড়ো ফরেষ্ট-অফিসার! লড়াই বেধেছে কি অম্‌নি চলে এসেছে ইস্‌পেনে। জঙ্গল গজাবার আগেই জঙ্গল ইজারা নেবার মৎলবে। আর বছর দুই যদি লড়াই চলে, এমনি সারা ইস্‌পেন্‌ দেখবি বেবক ফাঁক্‌। তার বছর পাঁচক পরে বেদম্‌ জঙ্গল! একেবারে গভীর অরণ্য।"

"রোদন করবার লোকটিও নেই!" দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে গোব্‌রা।

"আসল কথা কি জানিস্‌? ওই র‍্যাট্‌সাহেবই কি, আর ওই ক্যাট্‌ সাহেবই কি, আর ইস্‌পেনের এই লালমুখোগুলোই কি, আসলে এরা সব জংলী—এখনো সঠিক সভ্য হয়ে ওঠেনি তো। এখনো ঘোরতর জংলী, তাই এরা জঙ্গল ভালোবাসে, যুদ্ধ বাধিয়ে জঙ্গল বাধাতে চায়। আমাদের মত সুসভ্য নয় তো! আমরা কোথায় আসামের জঙ্গল কেটে সহর বসাচ্ছি, আর এরা কোথায়, বসানো সহর ভেঙে গুঁড়িয়ে জঙ্গল বানাতে যাচ্ছে! এতেই বোঝ্‌!

গোবর্দ্ধন বুঝবার চেষ্টা করে, প্রাণপন চেষ্টাই করে, কিন্তু পেরে ওঠে না। পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে সে।

ইতি মধ্যে অকস্মাৎ গগনপথে—

বাজ্‌বাজ্‌ বাজ্‌বাজ্‌বাজ্‌—

এবং সঙ্গে সঙ্গে—ব্রাম্‌ ব্রাম্‌!

গোবর্দ্ধন আর বিরক্তি চাপতে পারে না, চেঁচিয়ে ওঠে—"পাজি কোথাকার!"

হর্ষবর্দ্ধন গুরুগম্ভীর হন : "ছিঃ গোবরা, মুখ খারাপ কোরো না! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখ খারাপ করতে নেই! এখন কখন আছি, কখন নেই, ভগবানের নাম করাই ভালো নাকি? তবু শেষ মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম নিয়ে স্বর্গে যেতে পারবো। এই রকম স্থান কালে এরকম অবস্থায় কি মন্দ কথা মুখে আনতে আছে? ছিঃ! তুমি যদি ভালো করে ভেবে দ্যাখো তাহলেই বুঝতে পা—"

এমন সময়ে হর্ষবর্দ্ধনের অনতিদূরেই একটা বোমা এসে পড়ে। উৎক্ষিপ্ত মাটির চাপড়া ছিট্‌কে এসে ধাক্কা মারে তাঁর নাকে।

হর্ষবর্দ্ধন লাফিয়ে ওঠেন একেবারে : "ওরে বাবারে, গেছি গো! গেল বুঝি চোখটা! পাজি বলে পাজি! পাজির পাঝাড়া!"

চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে যারপর নাই মন্দ কথা সব তিনি মুখে আনতে থাকেন। যত খুসি হয় তাঁর, যতক্ষণ না তাঁর আশ মেটে তিনি ক্ষান্ত হন না।

গোবরা হাঁ করে শোনে।

তোমাদের মধ্যে যারা, হর্ষবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধনকে আগে থেকেই চেন, তারা এই দুই ভাইকে হঠাৎ 'ইসপেনের' যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে হয়ত একটু অবাক্ই হয়েছ। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার আর কি আছে, আজকের দিনে কোনো ব্যাপারেই বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবু কালমাহাত্ম্য যতই থাক, হর্ষবর্দ্ধনদের স্থান-পরিবর্ত্তনের কারণ আছে বই কি! কেন এই অঘটন ঘট্লো, তার একটু ইতিহাস আছে। সংক্ষেপেই বলা যাক্ এখানে।

হর্ষবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধন দু'ভাই, অল্পবিস্তর বড় লোক ও ক্যাবলা-প্রকৃতি। আসামের জঙ্গলে এঁদের প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা এবং সেখানেই এঁদের বসবাস। অকস্মাৎ ওঁদের খেয়াল হোলো টাকা ওড়াবার এবং নিজেরা উড়বার—এবং এ-উভয় কাজের পক্ষে কলকাতাই প্রশস্ত ও সুবিধাজনক বলে, সেই মহানগরীতে একদা সুপ্রভাতে ওঁরা পদার্পণ করলেন। তারপর থেকে দিনে দিনে ওঁরা দেহে আর অভিজ্ঞতায় যেমন শশিকলার (কিম্বা মর্ত্তমান কলার) মত বাড়তে লাগলেন, তেমনি কলকাতায় এসে যে সব মজার কাণ্ড ওঁরা বাধিয়েছিলেন, 'কলকাতার হাল্চাল' যারা পড়েছ, ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেচ নিশ্চয়।

রোজ রোজ সেই একই কলকাতাকে একঘেয়ে দেখতে দেখতে প্রায় ওদের অরুচি ধরে আর কি, এমন সময়ে হর্ষবর্দ্ধন প্রস্তাব করলেন—"চল্ গোবরা, এবার পাগলদের রাসলীলাটা

দেখে আসা যাক্। এজায়গায় তো হাড় হদ্দ দেখে নিলুম, এখানে আর বিশেষ কিছু নেই দেখবার !"

"পাগলের রাসলীলা ! সে আবার কোথায় দাদা ?"

"কেন, ম্যাড্রাসে ? নামেই তো প্রকাশ পাচ্ছে।" হর্ষবর্দ্ধন প্রাঞ্জল করে দ্যান্—"ম্যাড্ মানে কি ? ম্যাড ?"

পড়াশোনায় যে-ল্যাড্, দস্তুরমতই ব্যাড্, সেও অন্ততঃ ম্যাড কথাটার মানে জানে। গোব্রারও জানা ছিল।

অতএব ওঁরা দুভাই, মাদ্রাজে যাবার মৎলবে, মাদ্রাজেরই টিকিট কেটে, একদিন রেলগাড়ীতে উঠে বস্লেন, উঠে বস্লেন কিন্তু বোম্বে মেলে। ভুলক্রমেই।

ভুলটা ধরা পড়ল যথাসময়েই। অর্থাৎ যখন বোম্বায়ের প্রায় আধাআধি পথ ওঁরা পৌঁছে গেছেন, তখনই।

হর্ষবর্দ্ধন বলেন তখন—"তা বোম্বাই বা এমন মন্দ কি ! সেখানেই যাওয়া যাক্ ! কথায় বলে, বোম্বাইকা লাডডু ! খুব বিখ্যাত জিনিষ—যো খায়া উভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া উভি—"

গোবর্দ্ধন প্রতিবাদ করে—"উহু। বোম্বায়ের না, দিল্লীর !" তখন দুভায়ে বচসা বেধে যায়। লাডডু দিল্লীকা, না, বোম্বাইকা, যদি দিল্লীরই হয় তাহলে বোম্বায়ের কোন জিনিষ বিখ্যাত, এবং লাডড্ জাতীয় প্রসিদ্ধ যদি কিছু বোম্বায়ে আদৌ না থেকেই থাকে তবে লোকে, দিল্লী ছেড়ে, বোম্বায়েই বা মরতে যায় কেন, কি জন্যেই বা যায় ? এবং যদি বা যায়, গিয়ে

কি খেয়ে তবে পস্তায় তারা? আর পস্তাবার যদি সুযোগ নাই থাকে তবে কি জন্যেই বা বম্বে যাওয়া, এত কষ্ট করে'? লোকও নেহাৎ কম যাচ্ছে না তো বোম্বায়ে! এই বিরাট মেল্ গাড়ী ভর্ত্তি সকলেই ত প্রায় বোম্বাই-যাত্রী। এরা সব দিল্লীই বা যাচ্ছে না কেন তবে? লাডডুর কথা বিবেচনা করলে দিল্লীর প্রলোভনটাই ত প্রচণ্ডতর বলে মনে হয় ওঁদের!

যখন গাড়ী গিয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে থাম্‌ল্ তখন পর্য্যন্ত এই আলোচনাই চল্‌ছে দুজনের মধ্যে।

বোম্বায়ে নেমে ওঁরা খবর পান ওঁদের বিশেষ পরিচিত, আসামের ফরেষ্ট-অফিসার, র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেব ছুটি নিয়ে চলেছেন বিলেতে। এমন কি, উনি প্রায় জাহাজেই চেপে বসেছেন, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বোম্বাই থেকে পাড়ি মারবেন। এই রকম গুজব।

এতদিনের সম্বন্ধ-সূত্রের পর, এত কাছাকাছি এসে র‍্যাট্‌ক্লিফের সঙ্গে দেখা না করাটা ভালো দেখায় না—বিশেষ এটাকে যখন শেষ দেখাই ধরা যেতে পারে, অন্তত বেশ কিদিনের মত তো বটেই। বড় সাহেবের বিলেত-প্রাপ্তি এক্ বাড়ীর কর্ত্তার কাশী-প্রাপ্তি, অবশ্য দেহরক্ষা না করে'—প্রায় এক জাতীয় ব্যাপার। খুব কমই তাঁরা সেখান্ থেকে এ-মুখো হন। এসব যাত্রায়, ফেরার কথাই নেই বল্‌তে গেলে, প্রায় ফেরার্ হবার দাখিল!

কিন্তু র‍্যাটসাহেব যে কোন্ জাহাজে পাততাড়ি গুটোচ্ছেন, ওঁদের তো জানা নেই এবং জানা থাকলেও যে বিশেষ কিছু সুবিধে হোতো এমন মনে হয় না। কেননা অসংখ্য জাহাজের ভেতর থেকে সেই জাহাজটিকে চেনা আর খুঁজে বার করা সহজ ছিল না ওঁদের পক্ষে।

তবু, হয়ত, সেই জাহাজ, ভগবানের মত, নিজগুণেই দেখা দিয়ে বসতে পারে, এই ভরসায়, ওঁরা জাহাজঘাটার ইতস্ততঃ বিচরণ করতে থাকেন।

জেটির ওই সামান্য প্রসারের মধ্যেই, কেবল পায়চারির ফলে, ওঁদের যখন প্রায় পঞ্চাশ মাইল হাঁটা হয়ে গেছে, তখন সাদাসিদে-পোষাক-পরা এক পুলিসের-গোয়েন্দায় সন্দেহের উদ্রেক না হয়েই পারে না।

সে এসে ওঁদের পাক্ড়ায়—'কোন হ্যায় তুম্‌লোক? কাঁহাকা আদমী?"

"আসামী হ্যায়!" গর্ব্বের সহিত বলেন হর্ষবর্দ্ধন।

ব্যস, আর উচ্চবাচ্য নয়, অমনি সেই গোয়েন্দা,—এতখানি বিনা-পোষাকে যে তাকে পাহারোলা বলে, সন্দেহ করবার ঘুনাক্ষরও নেই,—তাঁদের গ্রেপ্তার করে' নিয়ে গিয়ে জেটি দারোগার কাছে হাজির করে।

"দো আসামী, দোনো ডাকু, পাকড় গয়ি সাব্!"

তারপরে অতিকষ্টে, তাঁরা আসামের লোক বলেই আসামী, স্বভাবতঃই আসামী, অন্য কোন অপরাধে আসামী নয়,

এবম্বিধ অনেক কৈফিয়ৎ দিয়ে, দারোগা-সাহেবের কবল থেকে কোনো রকমে উদ্ধার পান—এবং সেই অফিসারের কাছ থেকেই র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেবের হদিশ উদ্ধার করেন।

"দো আসামী পাকড়্ গয়ি সাব্ !"

তারপরে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্যের বিনিময়ে সেই সাদা-সিধে পাহারোলার সহায়তা নিয়েই তাঁরা র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌-সঙ্কুল সেই বিলেতগামী জাহাজের ডেকেই, অবশ্য আরো কিছু দাক্ষিণ্যের সদ্ব্যবহারে, সরসারি গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

র‍্যাট্‌সাহেব তো তাঁদের দেখতে পেয়েই পুলকে গ্যাঁট ম্যাট করে ওঠেন—"হ্যালো হাবাড়্‌ডান্‌, হ্যালো গাবাড়্‌ডান্‌! হাউ ডু ইউ ডু!"

হাবাড়্‌ডান গাবাড়ডান প্রত্যুত্তরে শুধু বলে—"হ্যালো, হ্যালো!"
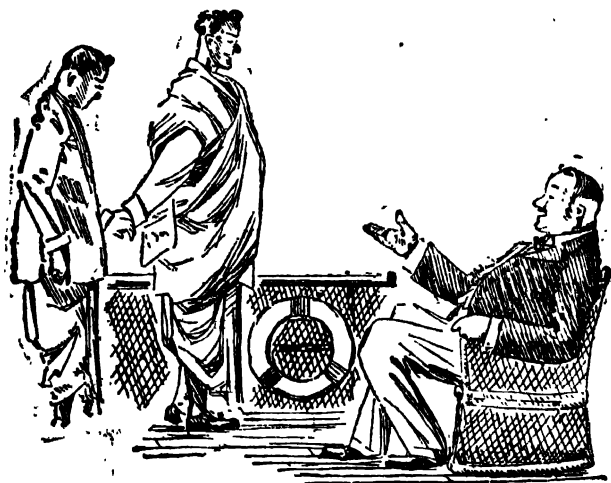
"হ্যালো হাবাড়ড্‌ন—হ্যালো গাবাড়ড্‌ন"

বহু দিবসের পরে, প্রিয়জন-মিলনে, আনন্দের আতিশয্যে ওঁদের সুবিধেমত কথাই বেরোয় না মুখ দিয়ে।

এ-কথা সে-কথার পর সাহেব ওঁদের জানান যে উনি বিলেতে যাচ্ছেন না এখন, এখান থেকে সোজা স্পেনে যাবেন, সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর তাঁর বিলেত।

হর্ষবর্দ্ধন জিগ্যেস করেন—"ইস্‌পেন? হোয়াই?"

"ফর্ রেস্ট্ !" সাহেব বলেন। এবং বিষয়টাকে আরো বিশদ করবার জন্য হিন্দীর খিচুরি মিশিয়ে দ্যান— "আলবাৎ, ফর হোয়াট্ এলস্ ?"

গোবর্দ্ধনও ইংরেজি কথায় দাদার কাছাকাছিই যায় প্রায়। সে বলে—"অফ্ কোর্স"। পিছ পা হবার ছেলে সেও নয়।

"ফরেষ্ট্ অলসো ইন্ ইস্পেন্ ?" হর্ষবর্দ্ধন প্রশ্ন করেন, দারুণ বিস্ময়েই।

"হোয়াই নট্ ? এ ভেরি রেষ্টফুল প্লেস, মোর্ সো ফর্ দি কজ্ অফ্ দি ওয়ার্ !" সাহেব হাস্য করেন।

গোবর্দ্ধন বলে—"অফ্ কোর্স।"

সাহেবের সব কথাই সে অবিকল বুঝতে পারে, তার দাদার মতই চমৎকার। তাই সব কথাতেই সায় দিতে সে কার্পণ্য করে না।—

এবার হর্ষবর্দ্ধনের 'অফ্কোর্স' বলার পালা ছিল, সুযোগটা, গোবর্দ্ধনের স্বার্থপরতার জন্য এভাবে হাতছাড়া হওয়ায়, তিনি মনে মনে গোব্রার প্রতি ভারী চটে যান।

তিনি শুধু বলেন—"দেন, উই গো! গুড বাই সাহেব! টেক্ য়্যাজ মেনি ফরেষ্ট য়্যাজ্ ইউ ক্যান্—ইন্ ইস্পেন্ !"

গোবর্দ্ধন বলে—"অফকোর্স! ইন ইনপেন! অফকোর্স।"

তারপর দু'ভাই বিদায় নেয় সাহেবের কাছে।

বিদায় নিয়ে, আসবার পথে, হঠাৎ এক বাধা পড়ে

এমন বিশেষ কিছু না, এক ক্যাবিনের মধ্যে, বেড়াল আর কাকাতুয়ার মধ্যে বাদানুবাদ—

বেড়ালটা, কতকগুলো কেক্‌কে একলা এবং অসহায় অবস্থায় পেয়ে, গলাধঃকরণের দুশ্চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কাকাতুয়াটা বাধা দ্যায়। ভীষণ চেঁচামেচি করে' ভয়ানক প্রতিবাদ করতে থাকে সে। বেড়ালের তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা!

হর্ষবর্দ্ধন আর গোবর্দ্ধন নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকেন। এমন অদ্ভুত দৃশ্য, ওঁরা আসামে দেখেন নি, কলকাতায় দেখেন নি, এ জীবনে দেখেন নি—

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, ওঁদের পলক্ পড়ে না, টনক নড়ে না। অবশেষে, জাহাজ যখন মাইল্ বিশেক্ এগিয়ে গেছে আরব সমুদ্রে, য়্যারেবিয়ার দিকে, তখন ওঁদের হুঁস্ হয়। কিন্তু তখন সমস্তটাই আরব্য-উপন্যাসের মতই মনে হতে থাকে ওঁদের!

কখনই বা ঘণ্টা দিল, কখনই বা ছাড়ল জাহাজ! এর মধ্যেই কেটে গেল এতক্ষণ? আশ্চর্য্য!

অগত্যা আবার তাঁরা র‍্যাট্ সাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনাটা ব্যক্ত করেন। এবং তাঁর সৌজন্যে ও সাদর নিমন্ত্রণে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, তাঁরাও ইস্‌পেনে যেতেই প্রস্তুত হন—কেননা অপ্রস্তুত হবার আর কোনো সুযোগ ছিল না তখন—তাঁরাও সাহেবের সহযাত্রী হয়ে পড়েন, স্পেন দেশীয় ফরেষ্ট-দর্শনের প্রত্যাশায়।

জাহাজে থাকতে কদিনে হর্ষবর্দ্ধনরা যেসব কাণ্ড বাধান
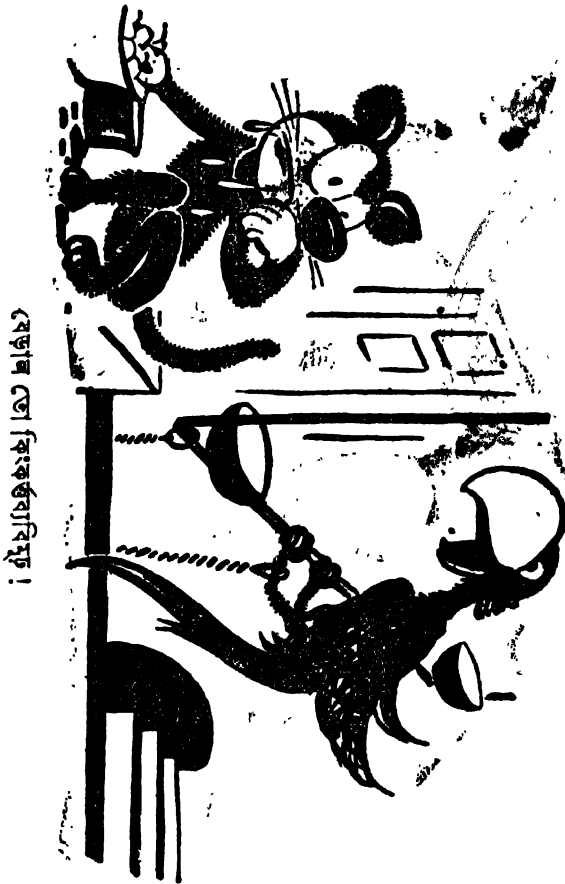
বেয়ারা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

সে হচ্ছে আরেক প্রকাণ্ড কাহিনীর ব্যাপার! যাই হোক্ র‍্যাট্‌ক্লিফ্‌-সাহেব তো কোনোরকমে দু'ভাইকে সামলে—

সুস্থলে, এবং সঙ্গে করে, স্পেনের উপকূলে এসে অবতীর্ণ হন। সেখান থেকে ম্যাড্রিড্-গামী এক ট্রেণে উঠে বসেন তাঁরা।

ডাঙায় নেমেই, ইস্পেন্ সম্বন্ধে, তাঁরা যেসব মন্তব্য করেছিলেন, ভাগ্যিস্ স্পানিয়ার্ডরা বাংলা বোঝে না, তার মানে টের পেলে তাদের আতিথ্য তাঁদের পক্ষে খুব মুখরোচক হোতো না নিশ্চয়। তবে সব কথার মধ্যে এই কথাটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"ম্যাড্রাস্ যেতে যেতে ম্যাড্রিড!" হর্ষবর্দ্ধন বলেছেন অবশেষে। "তুটোর মধ্যেই ম্যাড্নেস্ আছে ; যথেষ্টই আছে।"

"হ্যাঁ দাদা, ও তুইই এক।' গোবর্দ্ধন সর্ব্বতোভাবে সায় দিয়েছে দাদাকে। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হর্ষবর্দ্ধন সান্ত্বনা-লাভের চেষ্টা করেছেন—যা সামান্য-কিছ সান্ত্বনা পাওয়া যায়—এর ভেতর থেকে, এই ম্যাড্নেসের মধ্যে থেকেই।

এই পৃথিবীতে বাস করতে হলে পাগলদের সঙ্গেই বাস করতে হবে, পাগ্লামি বাঁচিয়ে পা ফেলা অসম্ভব। কাজেই, যেখানেই যাও, ম্যাড্নেস্কে সইতেই হবে, সহাস্য মুখেই সইতে হবে এবং সেই সঙ্গে তোমার কাজও হাঁসিল করতে হবে—সেই হাসিমুখেই। হ্যাঁ।

হর্ষবর্দ্ধনের উপরোক্ত এই গবেষণার এক বিসর্গও বুঝতে পারেনি গোবর্দ্ধন। তবু সে ঘাড় নেড়ে দিয়েছে। অকপটে, এবং অকাতরেই।

ট্রেন্‌পথে সামান্য একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। বিশেষ কিছুনা, কেবল আকাশ এবং এরোপ্লেন্ থেকে অকস্মাৎ এক বোমা পড়ে। ট্রেনের ওপরেই পড়ে। ঠিক হর্ষবর্দ্ধনদের ঘাড়ে নয়, এই যা রক্ষা—আপাততঃ। বিপদ-সঙ্কুল পথে ট্রেন্‌টা স্বভাবতঃই দ্বিধার সহিত অগ্রসর হচ্ছিল, বোমার আঘাতে, এতক্ষণে, সত্যিই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। একেবারে দু-আধখানা হয়ে যায়।

টিক্‌টিকির ল্যাজ্ কাটা পড়লে সে যেমন, মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়ালো সমীচীন মনে করে না, এমন কি পিছন ফিরে তাকায় না আর, নিজেকে নিয়েই সোজাসুজি ছুট্ মারে—তার পরিত্যক্ত অপভ্রংশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনা পর্য্যন্ত; রেলগাড়ীটাও তেমনি, মানে, তার ইঞ্জিনের দিকের অর্দ্ধাংশ, আর কালক্ষেপ না করে, সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গকে ফেলে রেখেই চটপট চম্পট ছায়, সটান্ ম্যাড্রিডের দিকেই।

ইঞ্জিনের দিকটাতেই ছিলেন র‍্যাট্‌ক্লিফ্ সাহেব, তিনি তো উধাও হলেন পলাতক অর্দ্ধাঙ্গে এদিকে পিছনের গাড়ীতে ছিলেন হর্ষবর্দ্ধন, আর গোবর্দ্ধন, তাঁরা ধরা পড়লেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জার্ম্মান-বাহিণীর খর্পরে! দুরদৃষ্ট আর বলে কাকে!

কিন্তু দূরদৃষ্টি থাকলে দূরদৃষ্টের হাত থেকে বাঁচা যায়। হর্ষবর্দ্ধনের এই দুরদৃষ্টি ছিল, ছেলেবেলা থেকেই ছিল স্বভাবতঃই ছিল। জার্ম্মান সেনানী যখন তাদের সবাইকে ঘেরাও করে, তাদের দলপতি এগিয়ে এসে, হাত তুলে নাৎসী সেলাম ঠুকে

অভিনন্দন জানায়—"হেইল্ হিট্‌লার!"—কাকে সম্বোধন করে কে জানে!

হর্ষবর্দ্ধনও ঠিক সেই কায়দাতেই হাত তুলে তেমনি বলেন: "হেই হেট্‌লার!" হর্ষবর্দ্ধন নির্ভীক, সঙ্কোচ কি কুণ্ঠা নেই, সহাস্য মুখ হর্ষবর্দ্ধনের। আধগাড়ী সবাই, ভূতপূর্ব্ব যাত্রী এবং সম্প্রতি বন্দী, যাবতীয় লোকের মধ্যে কেবল একমাত্র হর্ষবর্দ্ধনেরই হাত ওঠে, একলা তাঁরই হর্ষধ্বনি শোনা যায়।

গোবরাকে তিনি চাপাগলার দাবড়ি দ্যান—"এই কর্‌ছিস কি? হাত তোল্! চ্যাঁচা! নইলে কোর্‌বানি করে' ফেল্‌বে যে!"

গোবর্দ্ধন হাতটা তোলে কেবল। অতি কষ্টে।

"চ্যাঁচা! চ্যাঁচা! যে-বিয়ের যে-মন্ত্র জানিসনে? বল্—হেই হ্যাট্‌লার!"

গোবর্দ্ধন চেঁচায় "হুঁই হুট্‌লার!"

ফলে, জার্ম্মান দলপতি, ওদের দুভাইকে দলভুক্ত করে নেন—নাজীপক্ষীয় ভেবে। বাকী সব পাজীদের—তাঁর মতেই অবশ্য—বন্দী করে, কোর্টমার্শাল্ করা হয়, অর্থাৎ বন্দুকের সাম্‌নে সারি সারি সাজিয়ে দুড়ুম ঠুকে দেয়া হয়। পর পর।

প্রত্যেক দুড়ুমে হর্ষবর্দ্ধনের পিলে চমকায়, আর উনি বল্‌তে থাকেন "ছি ছি! কী খারাপ জায়গাতেই না এসে পড়া গেছে। কিন্তু ঐ অব্যর্থ মন্ত্র—হায় হাটলার, কিছুতেই ভুলিস্‌নে যেন গোবরা! ঐটা বল্লাম বলেই বেঁচে গেলাম

এযাত্রা ! ভালো করে, মুখস্ত করে' রাখ। তাহলেই টিকে থাক্তে পারবি। কোন গতিকে !''

অতঃপর হর্ষবর্দ্ধনরা, ফ্রাঙ্কোর দলের সঙ্গে, ওদের সহযাত্রী হয়ে,—দলীয়ান ও বলীয়ান হর্ষবর্দ্ধন,—ম্যাড্রিডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ম্যাড্রিড বিজয় করার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

কয়েকদিন ওদের সঙ্গে মিশেই, অনেক কিছুই শিখে ফেলেছেন উনি—এমন কি, 'হেল্ হেটলারের' সম্যক অর্থও ওঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর দলের মধ্যে, স্পেনীয় ছিল, ইতালীয় ছিল, জার্ম্মান ছিল, কিন্তু ইংরেজী-বিদ্যায় তারা সকলেই বিশেষ পারদর্শী, হর্ষবর্দ্ধনের সমানই প্রায়, কাজেই ভাবের আদান-প্রদানে কোনো পক্ষেই কোনো অসুবিধা ছিল না !

কেবল 'হেইল হিটলারের' সদর্থ জেনে হর্ষবর্দ্ধন একটু অসন্তুষ্টই হন: "আমি ভেবেছিলুম কোনো দেবতা-টেবতা, আরে ছাই, এযে মানুষ রে ! হাতী ঘোড়াও না—চার্‌পেয়েও না—একেবারেই মানুষ।"

গোবরা বলেছে: "কেন, মানুষ হোলো তো কী হোলো ? মানুষের নাম কি করতে নেই ? মানুষ কি খারাপ ? মানুষ যদি মানুষের মত মানুষ হয়—যদি অবতার হয়— ?"

"মানুষের মতো মানুষ না কচু ! মানুষের মত জন্তু বলতে পারিস বরং। মানুষ-মারা মানুষকে আর অবতার বলেনা।"

পাছে কী অনর্থ বাধে, যদি দৈবাৎ বাংলা বুঝেই ফ্যালে

ব্যাটারা, গোবর্দ্ধন দাদার মুখে, হাতচাপা দিয়েছে।

হাতের চাপকে অগ্রাহ্য করে'—তার ফাঁক দিয়েই হর্ষবর্দ্ধনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়েছে: "হ্যাঁ, হেটলার যদি হয় তবে আমরাই বা কি কম অবতার? আমরাও তো গাছ-মারা মানুষ! কত গাছকেই তো কেটে ধরাশায়ী করলাম! মানুষের মতই অকাতরে কচুকাটা করেই'—বল দেখি?"

গোবর্দ্ধনকে মানতে হয়েছে—"হ্যাঁ, সত্যিই, আমরাও অবতার কম নই তো! অন্ততঃ গেছো অবতার তো বটেই!"

আত্মপ্রসাদে হর্ষবর্দ্ধনের বুক ফেঁপে উঠেছে: "নেহাৎপক্ষে হাফ অবতার তো নিশ্চয়!"

তার পরেই তিনি অন্তরের মৎলব প্রকাশ করেছেন, এবার দেশে ফিরেই, তাঁর লোকজন-কর্ম্মচারীদের দিয়ে নিজেকে 'হেই হর্ষবর্দ্ধন!' বলে ডাকবেন—সদাসর্ব্বদাই ডাকবেন, আক্‌চারই ডাকবেন! ওরকম শুনতে ওঁর বেশ ভালোই লাগে। ইতিমধ্যেই—অবশ্য বাইরে চেঁচিয়ে নিজেকে তিনি ডেকে নিয়েছেন, ভালো করেই দেখে নিয়েছেন। মন্দ শোনায়নি নিতান্ত! তবে ওটা একটু ইংরিজি করে'—আরো সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে' 'হেই হাবাড়ড্‌ন!' করে' নিলে শোনায় আরো ভালো। নিঃসন্দেহ!

এ-পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হয়নি কিন্তু এর পরেই বেধেছে গোলমাল। হর্ষবর্দ্ধনকে দাদা ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ডাক্‌তে সে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। অথচ

হর্ষবর্দ্ধনের ইচ্ছা যে সেও হেই হাবাড়ড্‌নের দলভুক্ত হয়। পরিশেষে এই ভাবে রফা হয়েছে এই বিষয়েঃ দেশে ফিরে গেলে তবেই তো ডাকাডাকি! আগে দেশেই ফেরা যাক্—। সেইখানেই যে সন্দেহ-স্থল—দুজনারই সমান সংশয় সেখানে!

মাইলের পর মাইল হেঁটে—কত মাইল আন্দাজ করা কঠিন—অবশেষে ওঁরা এসে পৌঁছেচেন ম্যাড্‌রিডের সম্মুখে। ম্যাড্রিড অবরোধ করে' বসেছেন ওঁরা। ফাঁক পেলেই ওর ভেতরেই—ওই অবরুদ্ধ সহরের ভেতরেই নাকি ঢুকতে হবে, আজ কালের মধ্যেই — সবেগে এবং সতেজেই ঢুকে পড়তে হবে—এই রকম আশঙ্কা হয় হর্ষবর্দ্ধনের।

হর্ষবর্দ্ধন বলে: "বৎস গোবরা!"

"ঢুক্‌তে গেলেই কি ওরা ঢুক্‌তেই দেবে সহজে? সহরের মধ্যে আছে যারা?" গোবরা বলে। "গুলি ছুড়তে পারে হয়ত।"

"পারেই ত।"

"তাহলে তো প্রাণ

হারাবার ভয় আছে আমাদের ?" সংশয়টা আর প্রকাশ করে না পারে না গোবরা ; "নেই কি দাদা ?"

"আছেই ত।" হর্ষবর্দ্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন : "যুদ্ধু করা কি চারটিখানি ? ওতে প্রাণ বাঁচানোই কঠিন।"

গোবর্দ্ধন বলে : "প্রাণ দিতে হলে লোকে দেশের জন্যই প্রাণ ছ্যায়। বিদেশের জন্য শেষটা বেঘোরে মারা যাবো ?"

"প্রাণ দেয়া নিয়ে কথা ! প্রাণ দেয়াই হোলো আসল।" হর্ষবর্দ্ধন জবাব দিয়েছেন, অত্যন্ত উদাসীনের মতই : "মারা গেলে তখন দেশই বা কী—আর বিদেশই বা কী ! কার জন্যে দিলুম ভেবে কোনই লাভ নেই।"

লাভালাভের কথাটাই কিন্তু খতিয়ে দেখছে গোবর্দ্ধন। তখন থেকেই মনটা খ্‌চখচ্‌ করছে তার। কেবলি তার মনে হয়—য়্যাঁ, বিদেশে এসে শেষটা বাজে খরচ হয়ে যাবো, প্রাণটা দিয়ে ফেলব, পর্‌-দেশের জন্য ? য়্যাঁ ? পরের দেশোদ্ধারে প্রাণপাত করে' কী পরমার্থ ? ফয়দাটাই বা কী ? কেন, স্বদেশ কি ছিলনা গোব্‌রাদের—তার জন্যে অক্কা পাওয়া কি যেত না একেবারেই ? সেটা কি এতই শক্ত ব্যাপার হোতো ?

ইত্যাকার অগুন্তি প্রশ্ন ওর মনে এসে উঁকিঝুঁকি মারে। অবশেষে ও আর চাপ্‌তে পারে না, বেফাঁস্‌ করেই ফ্যালে :

"না, দাদা, এ ভালো হচ্ছে না—"

"কী ভাল হচ্ছে না ?"

"এই বিদেশের জন্যে মরাটা! একেবারেই ভালো ঠক্‌ছে না আমার!"

"তোর মৎলবটা কী?" হর্ষবর্দ্ধন দারুণ গম্ভীর হয়ে যায় যান: "নিতান্তই বেঁচে থাক্‌তে চাস্ নাকি?"

"না, বাঁচতে আমি চাইনে।" গোবর্দ্ধন ঘোরতর আপত্তি করে—"বেঁচে আবার থাকে মানুষ? বেঁচে লাভ? তবে আমি দেশে গিয়েই মর্‌তে চাই। বিদেশের জন্যে মরাটা কোনো কাজের কথাই না।"

"যুদ্ধ্ কোথায় তোর দেশে? যুদ্ধ্?" হর্ষবর্দ্ধন ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠেন এবার: "যুদ্ধ্ কি বাধে, না, বেধেছে কখনো সেখানে? কি করে' মর্‌তে পাবি শুনি?"

জবাব্ দিতে পারে না গোবরা। দাদার কথাটা মিথ্যে না।

হর্ষবর্দ্ধন আরো রাগ করেন: "মর্‌বার সুযোগই নেই স্বদেশে—সেই এক হাঁসপাতালে ছাড়া। আর উনি মর্‌তে চান্ স্বদেশে গিয়ে। ভারী ওঁর স্বদেশ!"

হর্ষবর্দ্ধন ঠোঁট বেঁকিয়েছেন।

স্বদেশের অপমানে গোব্‌রার প্রাণে লাগে। সে বলে—"বিদেশে যুদ্ধে মরার চেয়ে স্বদেশে আত্মহত্যা করাও ভালো।"

"তবে যা, মর্‌গে যা তুই স্বদেশে গিয়ে।" হর্ষবর্দ্ধন শেষ জবাব্ দিয়ে দিয়েছেন। "এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন তবে। স্বদেশেই চলে যা। আমি চাইনা তোকে। আমি কিন্তু এখানেই মরব। এই ইস্‌পেনেই—এই যুদ্ধেই—আল্‌বাৎ!"

পুনশ্চ তিনি যোগ করেছেন: "এখানে গোলার মুখে মর্‌তে কী মজা! আঃ!" আরামে ওঁর চোখ বুজে এসেছে "মরবই তো! দেখি কে বাঁচায় আমায়—দেখি?"

এরপর গোব্‌রা একেবারেই চুপ মেরে গেছে—আর কী বল্‌বার আছে তার? এরপর চালাতে হলে, নিতান্তই তাকে পা চালাতে হয়, কথা আর চলে না। কিন্তু এই পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে, স্বদেশে যাওয়ার চেয়ে, যমের বাড়ী যাওয়া—এমন কি এই বৈদেশিক বিভ্রাটে বিজড়িত হয়ে—হ্যাঁ, যমালয়ে যাওয়াও ঢের সোজা। কাজেই দাদার সঙ্গে এক যাত্রায়, মৃত্যুমুখে পতিত হবার জন্যেই সে প্রস্তুত হয়েছে।

ভালো করে' ভেবে দেখলে, মারা যাবার পর আর কিছুই বাকী থাকে না—না-কোনো সমস্যা, না-কিছু দুর্ভাবনা। প্রাণ গেলে আর থাকল কি? তখন আর মাথা ব্যথ্যা করে লাভ—কী জন্যে মর্‌লুম, কার জন্যে মরলুম, কোথায় বা মরলুম? মর্‌লুমই বা কেন? মর্‌লুম কিনা তাও জানবার উপায় নেই তখন! অতএব মরা নিয়েই হোলো কথা—মারা গেলে, কথাও চুক্‌ল, কাজও খতম্! আর তা ছাড়া, ভেবে দেখ্‌তে গেলে, নিজের দেশের জন্যে প্রাণ সবাই দেয়, গরু বাছুরেও, তারাও কিছু বিদেশে গিয়ে দেহত্যাগ করে না—সে আর এমন বেশি কথা কি—কিন্তু বিদেশের জন্য মর্‌তে যায় কে,—কটা যায়? এই কারণে, সমান মারাত্মক হয়েও বিদেশের জন্য মরাটাই বেশি সার্থক—হর্ষবর্দ্ধনের এই সার

সিদ্ধান্তে, অনেক ভেবেচিন্তে, সন্ধ্যা-নাগাদ, নিঃসন্দেহে, পৌঁছে গেছে গোব্‌রা।

যখন প্রাণ দেয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছুই থাক্‌ল না, তখন ওরা দুভাই, নিশ্চিন্ত মনে, যুদ্ধক্ষেত্রের ইতস্ততঃ এধারে ওধারে সর্ব্বত্রই নিরুদ্বেগেই চরে বেড়াতে সুরু করে' দিল! দু-একটা ছট্‌কা গুলি, ছিট্‌কে এসে, হাওয়ার ঝট্‌কা মেরে সাঁ করে চলে যায়, নাক-কাণের পাশ দিয়ে—গ্রাহ্যই করে না ওরা! মৃত্যুর সঙ্গে গায়ে পড়ে কোলাকুলি বাধাতেই যেন ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা।

"দূর্, এম্‌নি করে, ঘাঁটি আগ্‌লে পড়ে থেকে কী লাভ?" হর্ষবর্দ্ধন বলেন: "কেবল বাজে নময় নষ্ট!"

গোবর্দ্ধন অনুযোগ করে: "ফ্রাঙ্কোর লোকেরা গালে হাত দিয়ে সব ভাব্‌ছে বোধ হয় যে কী করা যায় এখন!"

"জেনারেল্ মশাই বোধ হয় ভেবে ছিলেন্ যে উনি আসা মাত্রই ম্যাড্রিডের লোকরা দরজা খুলে সমাদরে ওঁকে অভ্যর্থনা করে' নিয়ে যাবে সদলবলে।"

"ম্যাড্রিড দখল করা—ওসব ফ্রাঙ্কো টাঙ্কোর কর্ম্ম না।" গোবর্দ্ধন বলে, "ম্যাডরাস্‌ই নিতে পারত কিনা কে জানে, তা, ম্যাড্‌রিড্!"

"রাসলীলাটা দেখা হোলো না জীবনে—" হর্ষবর্দ্ধন দুঃখ করেন—"পাগলদের রাসলীলা!"

"ম্যাডরিডে ঢুক্‌তে গেলে অনেক কাণ্ড দেখতে পাব দাদা ?" গোবর্দ্ধন দাদাকে সান্ত্বনা ছ্যায়—"রাসলীলার কম কিছু হবে না সে। ঢুকি তো একবার !"

"হঁ্যা, ঢুক্‌তে পেলে তো !" হর্ষবর্দ্ধনের ক্ষোভ যায় না। "হু দলে মিলে যা মৎলব এঁটেছে, দেখছি, তাতে এরাও ঢুক্‌ছে না—ওরাও, দিচ্ছে না ঢুক্‌তে।"

"হুদলের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র হয়নি তো দাদা ?"

"বিচিত্র নয় !" হর্ষবর্দ্ধন মাথা চালেন ! "হলেই হোলো ! জংলীদের মধ্যে সব কিছু হওয়াই সম্ভব ! আশ্চর্য্য কি ?"

"এক কাজ কাজ করা যাক দাদা—" গোবরা বলে : "এসো, আমরা লাগি। এদের ষড়যন্ত্র ভেঙে দিই না কেন ?"

"কী করে'—শুনি ?" হর্ষবর্দ্ধন সামান্যই উদ্‌গ্রীব হন্‌।

"আমরা দুজনেই এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করিনা কেন ? আমরা দুজনেই তো ম্যাড্রিড্‌ জয় করে ফেল্‌তে পারি ?,'

"কুল্লে এই দুজনে ? তুই আর আমি—এই দুজনে ?" হর্ষবর্দ্ধনের সংশয় হয়—"দুজনে মিলেই ম্যাড্রিড্‌ দখল করে' নেব—বলিস্‌ কি ?"

"এমন আর কি অসম্ভব দাদা ? হনুমান যে, একা একাই লঙ্কা জয় করেছিল ! আমরাই পারব না ? কী যে বলো তুমি ? তুমি—তুমিতো একাই একশ ! নয় কি ?"

হর্ষবর্দ্ধন বলেন—"তা বটে। সে কথা বটে !" উনি যে

গাছের ডালে হর্ষবর্দ্ধন। কী ওটা কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে।

একাকী একশ'র সমকক্ষ, সে বিষয়ে কোনদিনই ওঁর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

"আর আমিও একশ।" গোবরা বলে, "দুজনে মিলে আমরা দুশ। নয় কি?"

গোবরা, গোবরজাতীয় একশজনের সমান, কেঁদে-ককিয়ে হয়ত হলেও হতে পারে—কিন্তু একজন হর্ষবর্দ্ধনেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই ওর পক্ষে—এইরকমই একটা কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল হর্ষবর্দ্ধনের। সেই সনাতন ধারণা থেকে থেকে তাঁকে টলানো যায় না—তিনি প্রতিবাদ করতে যান—

গোবরা বলে: "বেশ কত তবে, আমরা দুজনে মিলে? তুমিই বলো? একশ পঁচানব্বই? না? একশো আশী? তাও না? তবে কি একশ পঞ্চাশ? এত কম?—" গোবরার গলা ভারী হয়ে আসে।

"না না। তার বেশী—তারও বেশী।" ভাইয়ের মনে ব্যথা দিতে প্রাণে লাগে দাদার। ভাইকেও মনক্ষুন্ন করবেন না, অথচ সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠাও হবে—এক ঢিলে দু পাখী মারার মৎলব তাঁর। "আরো কিছু ওঠ।" তিনি বলেন।

গোবরা আরো কিছু ওঠে: "একশো বাহান্ন? আরো বেশি? একশো বাষট্টি? আরো? পঁয়ষট্টি? হ্যাঁ—এক শো পঁয়ষট্টি? আরে বেশী বলছ? একশো উনসত্তর?"

"একশো বাহাত্তর হলেই ঠিক হবে।" চুলচেরা বিচার করে বলেন হর্ষবর্দ্ধন "তুই আমার চেয়ে আটাশ জন কম—সেই যথেষ্ট।"

সংখ্যার গোলমাল মিট্‌লে আর শঙ্কার কিছু থাকে না অতঃপর। প্রাণের ভয় তো ছিলই না ওঁদের—বিদেশের জন্য জীবন দিতেই বেরিয়েছেন—তবে আর পিছপা হবেন কেন? কার জন্যেই বা? পেছবেনই বা কোথায়?

সন্ধ্যার মুখেই সেই একশ বাহাত্তর জন, দু'টি মাত্র বন্দুক কাঁধে, বেরিয়ে পড়ে ম্যাড্রিড আক্রমণে। বিজয়-অভিযানে বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়ে—কারু তোয়াক্কা করে না।

হর্ষবর্দ্ধনরা প্রবল পদবিক্ষেপে যেদিক্‌পানে অগ্রসর হন, সেদিকটার মোহড়া নিয়েছিলেন লা-পাসানোরিয়া! স্পেনীয় এই-মেয়ে সেনাপতির নাম, খবরের কাগজের দৌলতে, তোমরা শুনেছ, বোধকরি। অতি আধুনিক এই সংগ্রামে, মেয়েরাও যে মহাসমারোহে যোগদান করেছে, এই সংবাদও তোমাদের অজানা নয়, নিশ্চয়!

লা পাসানোরিয়া! এই নামে পাষাণেরও হিয়া বিক্ষুব্ধ হয়। অবশ্য হর্ষবর্দ্ধনের বিচলিত হবার ছিলনা কিছু। ও-নামের লেশমাত্রও তাঁদের কানে প্রবেশ করেনি কোনো দিন। জানা তো দূরের কথা।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো পর্য্যন্ত যাঁর সম্মুখীন হতে সহজে রাজি হতেন কিনা সন্দেহ, অসমসাহসী ও অসহায়, সেই একশো

বাহাত্তর জন বীরপুরুষ, বিকল্পে, ওরা দুভাই, একেবারে সোজাসুজি, তাঁরই হুদ্দায় গিয়ে হাজির হয়।

"দাদা, ছাখো ছাখো—!" গোবর্দ্ধন দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ
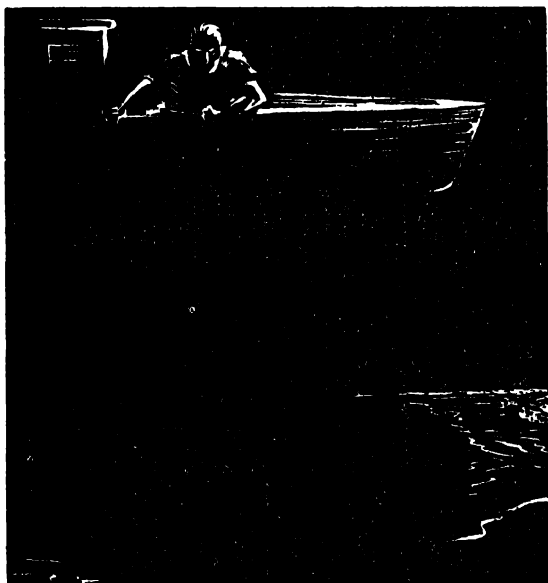
লাফ দিতে উদ্যত হর্ষবর্দ্ধন

করে—"ঐ ধারটায়, ঐ গর্ত্তগুলোর ধারে—খাদ্‌টার পাশে, বস্তাগুলোর আড়ালে—মেয়েরা নয় সব ?"

"দূর্‌!" না-দেখেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন হর্ষবর্দ্ধন : "মেয়েরা কেন মর্‌তে আসবে যুদ্ধে ? পাগল হয়নি তো তারা !"

কিন্তু দেখবামাত্রই ওঁর চক্ষু ছানাবড়া হয় : "য়্যাঁ, তাইত

মেয়েরাই তো !···সৈন্য সেজেছে দেখচি···তাজ্জব !···"

এবং সঙ্গে সঙ্গে, দুর্দৈবক্রমে, মেয়েরাও তাঁদের দেখতে পায়। দেখতে না দেখতে ঘেরাও করে ফেলে !

চারিদিকেই খাড়া-করা বন্দুক, প্রত্যেক মেয়ের হাতেই, এবং খুব সম্ভব এয়ার্‌গান নয়---হর্ষবর্দ্ধন ভালো করেই লক্ষ্য করেন,—সত্যিকারের বন্দুক বলেই তাঁর সন্দেহ হতে থাকে। এবং যেটুকু সংশয়ও বা ছিল, একজনের হাতে আচম্‌কা সঙীনের একটা খোঁচা খেয়ে, একমুহূর্ত্তেই তা উপে যায়।

হর্ষবর্দ্ধন আর্ত্তনাদ করে ওঠেন। জীবনে সঙ্গীন ব্যাপারের সম্মুখীন তিনি এই প্রথম—এসব খাদ্যের সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় ছিল না এর আগে, কল্পনাও করতে পারেননি কোনোদিন, কাজেই, খুব সহজে হজম করতে পারেন না হর্ষবর্দ্ধন।

"খুব লেগেছে নাকি দাদা ?" জিগ্যেস্ করে গোব্‌রা।

"দূর্‌, লাগ্‌বে কি ? লাগে নাকি কখনো ?" যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে' হর্ষবর্দ্ধন বলেন : "লাগবার কী আছে ওতে ? আর, যুদ্ধ করতে গেলে অমন এক-আধটু লাগে। লেগেই যায়, তাতে কি ?"

গোবর্দ্ধন প্রবোধ মানে না, যে-মেয়েটি দাদাকে গুঁতিয়ে ছিল, তার দিকে বন্দুক উঁচায়।

ব্যস্ত হয়ে বাধা দ্যান হর্ষবর্দ্ধন : "আরে আরে—মেয়ে ছেলে যে !"

"মেয়ে ছেলে না হাতী !" গোবরা তখন ক্ষেপে গেছে

"মেয়েমানুষের বাবা ওরা—পাপ নেই ওদের মার্‌লে।"

"ছি গোব্‌রা, আমরা তো এদের মতো জংলী নই, আমরা আর্য্য সন্তান, সনাতন কাল থেকে সুসভ্য, মেয়েদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে নেই আমাদের। নইলে আমিই কি মার্‌তে পারতুম না? আমার কি বন্দুক নেই? যুদ্ধ করতেই তো বেরিয়েছি আমি—আমিও, নয় কি?"

গোবর্দ্ধন হাত নামায়—"আচ্ছা, গুলি যদি না করি, শুধু বন্দুক দিয়ে পিটি—পিটে দিই কেবল—তাহলে?"

"তাহলেও দোষ। আমরা আর্য্যরা মেয়েদের সাম্‌নে একেবারে নিরস্ত্র।" এই বলে, হর্ষর্দ্ধবন নিজের বন্দুক ছুড়ে ফেলে ছ্যান দূরে! "ওরা যদি মেয়ে না হয়ে নিছক্ গরুও হোতো তাহলেও তাই করতাম্, গোরুদের সঙ্গেও আর্য্যরা কখনো যুদ্ধ করে না।"

"পেরে ওঠে না তাই।" গোবর্দ্ধন গজ্‌রায়—"গুঁতিয়ে ছায় পাছে সেই ভয়ে।"

"কেন পড়িস্‌নি রামায়ণে?" হর্ষবর্দ্ধন স্মৃতিশক্তির সাহায্যে পুরাতন পঙ্কোদ্ধার করেন: "মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু। রথে বেঁধে এনেছিল তিন জোড়া গরু। ফলে হোলো কি, রামচন্দ্র বাণ ছুঁড়্‌তেই পারলেন না!"

"সোজা পিট্‌টান দিলেন?"

"কী করলেন মনে নেই। তবে গোহত্যা করেননি ঠিক। তাহলে লিখ্‌ত রামায়ণে।"

অগত্যা গোবর্দ্ধনকেও বন্দুক ফেলে দিতে হয়! তখন পাষাণ-হৃদয়া লা-পাসানোরিয়ার দলবল ওঁদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যায়! নিয়ে যায় ম্যাড্রিডের মধ্যেই।

ভেতরে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধনরা ছ্যাখেন, তাঁদের দলের আরো জনকয়েক ধৃত হয়ে রয়েছে সেখানে। কতিপয় ইতালীয় ও জার্ম্মান। মেয়েদের হেফাজতেই রয়েছ।

রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট ও হর্ষবর্দ্ধন

জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন, কোর্ট্মার্শালের প্রতীক্ষাই করছে তারা। কেবল হর্ষবর্দ্ধনের অপেক্ষাই ছিল—রাত্রি আরো কিছুই ঘনীভূত হলে' তাদের সবার বিচার একসঙ্গেই সুরু হবে এইরকম জানা গেছে!

"কোর্টমার্শাল্ কী দাদা?" গোবর্দ্ধন জানতে চায়।

হর্ষবর্দ্ধন তাঁর যৎসামান্য ইংরেজির সাহায্যেই বন্দীদের কাছ থেকে ধার করে' নিয়ে গোবরার কৌতুহল চরিতার্থ করেন "এরা বল্ছে যে সরাসরি সামরিক বিচার, তার আইন নেই, কি, কাইন্ নেই—একেবারে সোজাসুজি প্রাণদণ্ড।"

"য়্যাঁ, ঝুলিয়ে দেবে নাকি? বলো কি দাদা?"

"উঁহু। ফাঁসি নয়—ভয় নেই তোর—" হর্ষবর্দ্ধন আশ্বাস ছান: "এরা বল্ছে যে গুলি করে' মারবে—সেই যেমন ট্রেণ ছুর্ঘটনার পরে হয়েছিল।"

গোবর্দ্ধন বিশেষ ভরসা পায় না।

হর্ষবর্দ্ধন বলেন: "বিশ্বাস হয়না আমার। মেয়েরা কখনো গুলি করতে পারে? ছুঁড়তে পারে বন্দুক? পাগল! উলটে পড়ে যাবে তাহলে।'

"তবে—তবে কোর্ট্মার্শাল্ বল্ছে যে!"

"সে কি পুরুষদের মত সেই ধরণের হবে? এদের কোর্ট মার্শাল নিশ্চয় আলাদা রকমের!" হর্ষবর্দ্ধন ব্যক্ত করেন: "হয়ত কোর্টশিপের মত হতে পারে। সেও তো মেয়েদের কাণ্ড! এই রকম সব মেয়ের!"

"কোর্ট শিপ আর্ কোর্ট মার্শাল কি এক হোলো দাদা?" গোবর্দ্ধন আপত্তি করে।

"নয় কেন? তাতেও আদালত আছে, এতেও আদালত আছে। কোর্ট মানেই তো আদালত? তবে ওতে হচ্ছে ছাগল নিয়ে টানাটানি—"

গোবরা বাধা দ্যায়—"উঁহু। শিপ্ মানে ভ্যাড়া, ছাগল না।"

"বেশ ভ্যাড়াই হোলো—ও একই কথা।" হর্ষবর্দ্ধন মেনে নেন—"ভ্যাড়া আর ছাগল কি আলাদা? দুজনেই সমান সুখাদ্য—একেবারে অভিন্ন।"

"তা বটে। পায়ের সংখ্যা, শিং এবং আওয়াজ প্রায় সমান্ সমান্।" গোবর্দ্ধন সমর্থন করে।

হর্ষবর্দ্ধন তাঁর গবেষণাটা সমাপ্ত করেন—"কোর্ট্ শিপে হোলো গে ভ্যাড়া নিয়ে টানাটানি, আর এটাতে—এটাতে—" তাঁর আম্তা-আম্তা আরম্ভ হয়—"প্রাণ নিয়েই টানাটানি কিনা কে জানে!"

কোর্ট্ মার্শাল্ সুরু হয়ে যায় ততক্ষণে। মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন জার্ম্মানের প্রাণদণ্ডের হুকুম জাহির হয়।

তারপর সে-বেচারীকে তো নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হয় দুজন বন্দুক-ধারিণীর সাম্‌নে। সে কি দাঁড়াতে চায় সহজে? মেয়েছেলের সাম্‌নে দাঁড়াতে তার লজ্জা করে, তাদের হাতে মারা যেতে কেমন সঙ্কোচ হয়। বার বার তাকে খাড়া করা হয়, বারবারই সে বসে পড়ে। মাটিতেই।

তখন কোর্ট্ মার্শালের দ্বিতীয় হুকুম জারি হয়: "আচ্ছা, আয়েস্ করেই মর্‌তে দাও ওকে। বসেই দেহরক্ষা করুক্!"

প্রহরিণীদের দুজনেই বন্দুক ছোঁড়ে, প্রথমে আলাদা আলাদা, তারপরে যুগপৎ, তারপরে যদৃচ্ছাক্রমে—কিন্তু ত্রিশ

বত্রিশ বার গুলি বৃষ্টির পরেও, লোকটা ঠায় বসে থাকে। একটাও গুলির ছোঁয়াচ লাগে না তার গায়ে।

প্রথমে বেচারীর চোখ কপালে উঠে গেছল, এখন ক্রমশঃ ওর মুখে হাসির আভাস দেখা যায়—সলজ্জ হাসি। সে এবার হাত পা ছড়িয়ে ভালো হয়েই বসে—তোফা আরাম করেই। বিনা পয়সায় ম্যাজিক্ দেখ্ছে যেন!

হর্ষবর্দ্ধন এতক্ষণে রুদ্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। গোবর্দ্ধনও হাঁপ্ ছাড়ে। "ওঃ, এই এদের কোর্ট্ মার্শাল্!"

"তখনই বলেছি আমি, বন্দুকের কম্ম না মেয়েদের।" হর্ষবর্দ্ধন বলেন—"অস্ত্র ওদের ধর্ত্তব্যই নয়! হাতা কি খুন্তি হলে ভয় ছিল বটে! সেরে ফেল্‌ত এতক্ষণে! খুঁচিয়েই সেরে ফেল্‌ত!"

বন্দুকধারিনীদের এবার অবসর দেওয়া হয়। ষণ্ডা গোছের দুটি মেয়ে এগিয়ে আসে অতঃপর। মৃত্যুদণ্ডিত মৃদুহাস্যপরায়ণকে গ্রেপ্তার করে, কাছাকাছি একটা বাড়ীর গাত্রলগ্ন স্পাইরাল্ সিঁড়ি বেয়ে টেনে নিয়ে চলে—সেই বাড়ীরই তিন তালায়।

ওরা দুভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—এ আবার কি রহস্য? কোর্ট্‌মার্শালের পালা শেষ হয়ে কোর্টশিপের পালা সুরু হোলো নাকি এবার? হর্ষবর্দ্ধন মাথা ঘামান্।

সেই বাড়ীটাই সেখানে কাছাকাছি এবং একমাত্র বাড়ী সেখানে। যেস্থলে এই মারাত্মক আদালত বসে-

ছিল সেটা সহরের প্রান্ত সীমায়, প্রায় মিলিটারী ঘাঁটির মধ্যেই। তার চারধারের বাড়ীঘর বোমার কুদ্‌রতে খুব কমই আস্ত ছিল, এই বাড়ীটিই কেবল বিধ্বস্ত হতে বেঁচে গেছে কোনরকমে। লা-পাসানোরিয়ার ঘাঁটিওয়ালীদের আস্তানা হয়েছিল তাই এইখানেই।

বাড়ীটার পাশেই, ট্রেঞ্চের মধ্য দিয়ে, সামরিক উদ্দেশ্যে খালকাটা হয়েছিল—দুর্দ্দমনীয় জলস্রোত সেই খালে।

গোবর্দ্ধন সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ করেঃ "হাত পা বেঁধে ওই খালে ফেলে দিলেই পারে! এক্ষুনি ল্যাটা চোকে!"

হর্ষবর্দ্ধন ভাইয়ের মুখচাপা দ্যানঃ "ওদের আর বুদ্ধি বাংলাসনে গোব্‌রা! একেই মা মনসা তার ওপরে—"

জলে ডুবে মর্‌তে ভারি ভয় হর্ষবর্দ্ধনের। মারা যাবার যাবতীয় প্রণালীর মধ্যে ওতেই ওঁর সবচেয়ে বেশি অরুচি।

"হ্যাঁ, ওরা আবার বাংলা বুঝবে!" গোব্‌রা বলে।

"বুঝতে কতক্ষণ? আমরা যদি ওদের ইংরিজি বুঝতে পারি—" স্পেনীয়দের ইংরেজী হর্ষবর্দ্ধনের কাছে, উড়েদের কাছে বাঙালীর হিন্দী বাৎএর মতই জলবৎ-তরলং "আর ওরা বুঝবে না আমাদের বোল্‌চাল্? কি যে বলিস!"

ততক্ষণে জার্ম্মানটাকে নিয়ে ওরা দাঁড় করিয়েছে তেতালার খোলা বারান্দায়। বারান্দাটা যেন ঠেলে

বেরিয়ে এসেছিল বাড়ী থেকে—যেমন অদ্ভুত বাড়ী, তেমনি তার সিঁড়ি, আর তেমনি তার কিম্ভূত কিমাকার বারান্দা ; সবই বিট্‌কেল্ রকম !

দুই ভাই উর্দ্ধমুখে, উৎসুক চোখে তাকিয়ে দ্যাখেন—

জার্ম্মানটাকে ওরা বারান্দার কিনারায় টেনে এনে ধাক্কিয়ে দ্যায় একদম্ নীচের দিকে, নীচের অন্ধকার আব্-ছায়ার মধ্যে। অধঃপতনের মুখে ঠেলে দ্যায় একদম্।

চরম মুহূর্ত্তে এসে জার্ম্মানটা জান্‌তে পারে যে তার চূড়ান্ত মুহূর্ত্ত সন্নিকট। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই সে প্রস্তুত হয়ে নেয়। এতক্ষণ সে আপনমনেই মুচ্‌কি হাস্‌ছিল, কিন্তু হাসিটা আপাততঃ স্থগিত রাখে। উপর থেকে পড়তে পড়তেই সে বাহুবিস্তার করে—নাৎসী সেলামের কায়দায়। পড়তে পড়তেই বলে—'হেইল হিট্‌লার' ! শূন্যমার্গেই বলে ! বল্‌তে বল্‌তেই পড়ে। আর যেম্‌নি তার ভূমিসাৎ হওয়া অম্‌নি সে ছাতু ! তৎক্ষণাৎ !

এই ভাবে আরো কজন জার্ম্মান্ ও ইতালীয়ান্‌কে কোতল করা হয়, পরবর্ত্তী তারা কিন্তু সহজে আত্মসমর্পন করে না। সহাস্যমুখে তো নয়ই ! বীর পুরুষের মতই দারুণ ধ্বস্তা-ধ্বস্তি বাধিয়ে দ্যায়। তখন আরো বেশী মেয়ে এসে লাগে—একাধিক ক্ষুদে পিঁপ্‌ড়েয় একটা বিপুল দেহ-পিঁপ্‌ড়েকে যেভাবে বিদেহ করে—অবিকল সেই সীস্‌টেমে—কেউ হাত, কেউ পা, কেউ ঘাড়, কেউ বা কান ধরে'—অর্থাৎ সকলে

মিলে সমবেত ভাবে ধরাধরি করে' টেনে হিঁচ্ড়ে প্রত্যেক বন্দীবরকে বধ্যভূমিতে উত্তোলিত করে। এবং প্রায় চ্যাংদোলায় তুলিয়েই ছুড়ে ফেলে দ্যায় তাদের। 'হেল হিট্লার' হাঁক্বারও ফুর্সৎ পায় না অনেকে।

এগুলো ঠিক যেন কোর্টশিপের নিয়মসঙ্গত হচ্ছে না, হর্ষবর্দ্ধনের কেমন সন্দেহ হতে থাকে।

কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোর অবকাশ তিনি পান্ না। তাঁরও তলব্ এসে পড়ে। চারজন ষণ্ডা-গোছের মেয়ে এসে পাক্ড়াও করে তাঁকে, হর্ষবর্দ্ধন টের পান্ যে তাঁরও আশু উন্নতি আসন্ন—এবং তার পরেই অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ অবনতি—একেবারে গতাসু হবার ধাক্কাই বল্‌তে গেলে!

হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যসন্তান, মৃত্যুর সাম্নে সহজে ভীত হবার পাত্র নন্। প্রথম জার্ম্মানটার মত অতখানি হাসি তাঁর পায় না, তবু ঈষৎ হাসবার তিনি প্রয়াস পান্। তাঁকে পাঁজা কোলা করবার উপক্রম করতেই তিনি হাত নেড়ে বাধা দ্যান্ঃ "উঁহু। আমরা আর্য্যসন্তান। এম্‌নিই আমি যাব। না সাধ্‌তেই! আমাদের পুনর্জ্জন্ম আছে, ভয় খাইনে আমরা।"

হর্ষবর্দ্ধন উঠে পড়েন আপ্‌নিই: "চল্লাম্ গোব্‌রা!"

"পিছনেই আছি দাদা!" গোব্‌রা বলে। "আমিও যাচ্ছি সঙ্গে!" তাকে কেউ ডাকে না—তখনো প্রাণদণ্ড হয়নি তার—তবু সে দাদার অনুসরণ করে' বিনা-নিমন্ত্রণেই।

গীতার শ্লোক্ আওড়াতে আওড়াতে দাদা অগ্রসর হন্ঃ "যদাযদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুৎ—অভ্যুৎ—" উত্থানের কাছাকাছি এসে আট্কে যায় হর্ষবর্দ্ধনের। বারম্বার আট্কে যায়।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ!"—গোব্রা মনে করিয়ে দ্যায়।

"উঁহু উঁহু।" হর্ষবর্দ্ধন ঘাড় নাড়েন।

"শরীরমাদ্যম্ খলুধর্ম্ম সাধনম্?" গোব্রার জিজ্ঞাস্য হয়।

"উঁহুহু।" হর্ষবর্দ্ধন ভারী বিরক্ত হন্ এবার—"খলু ধর্ম্মও না, কলু-ধর্ম্মও না, আসল ভগবানের বাণী—চারটিখানি কি?" পুনরায় তিনি দুশ্চেষ্টা করেনঃ "গ্লানির্ভবতি ভারত—অভ্যুৎ—অভ্যুৎ—"

"ভগবানের কথার মধ্যে আবার ভুত কেন দাদা? ভুত কি ভগবানের চেয়ে বড়?" গোব্রা নিজেই নিজের প্রশ্নের সদুত্তর দ্যায় তক্ষুনিঃ "তাহবে হয়ত। ভগবানের চেয়ে ভুতেরই তো ভয় বেশী—ঢের ঢের বেশী।"

"হয়েছে হয়েছে!" খাতিয়ে ওঠেন হর্ষবর্দ্ধন—ভুতের আলোচনায় তাঁর মনে পড়ে যায় হঠাৎ!—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু তদাত্মনম্ সৃজাম্যহম্।"

"হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।" গোব্রাও—উৎসাহ পায়—"সমস্কৃত সমস্কৃত শোনাচ্ছে ঠিক।"

"আমি আবার নিজেকে সৃষ্টি করব— কিছুতেই মারা পড়ে থাক্‌ব না—বুঝেচিস্ গোব্‌রা!" হর্ষবর্দ্ধন গুরুতর কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ "শাস্তরের কথা! ঐ শোলোকেই বলে' দিয়েছে। এতখানি অনাসৃষ্টি বরদাস্ত করতে পারবনা আমি। কিছুতেই না। হুম্।"

"তাই কোরো দাদা!" করুণ কণ্ঠে বলে গোব্‌রা— "তবে সৃষ্টির সময়ে আমাকেও যেন বাদ দিয়ো না দাদা! তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না আমি। গোব্‌রার গলা ভার ভার। "ভুলে যেয়ো না যেন আমায়!"

আগে-পিছে মেয়ে বডিগার্ড—সব পিছনে গোবর্দ্ধন— সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে হর্ষবর্দ্ধনের মনে হতে থাকে, আহা, কেউ যদি, এখন নীচে, বারান্দার ঠিক নীচটাতেই, একটা লম্বা বোম্বাই চাদর বিছিয়ে টেনে ধর্‌ত, তাহলে তিনি অনায়াসেই লাফ্ খেতে পারতেন—হাড়্‌গোড়ের মায়া না রেখেই, প্রাণদণ্ডের থোড়াই কেয়ার করে'। হাত পা ছেড়ে দিয়েই লাফাতেন, ছড়িয়েই লাফাতেন, অনায়াসেই, অসঙ্কোচেই, এমনকি, দারুণ উৎসাহের সঙ্গেই লাফাতেন— যতবার বল্‌ত ততবারই। কিন্তু হায়, হর্ষবর্দ্ধনের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, কোথায় বা এখন বোম্বাই চাদর আর কেইবা টেনে ধর্‌ছে, আর যদিই বা পাওয়া যায় দৈবাৎ, পতনশীল হর্ষবর্দ্ধনকে সাম্‌লানো একা গোর্দ্ধনের কর্ম্ম না। তবে

হ্যাঁ, তাঁর না হয়ে যদি গোব্‌রার লম্ফ-দণ্ড হোতো, তাহলে তিনি কেবল হাত বাড়িয়েই, উর্দ্ধবাহু হয়েই, গোবর্দ্ধনকে ধারণ করতে পারতেন, চাদরের প্রয়োজনই হোতোনা, রসগোল্লার মতই লুফে নিতেন ওকে!

হর্ষবর্দ্ধন বারান্দার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ান্, তাকান্ নীচের দিকে একবার—মনে মনে নীচতার পরিমাপ করেন। নাঃ, এখান থেকে আছাড় খেলে নিতান্তই দাদৃহারা হতে হবে গোব্‌রাকে। একান্তই পুনর্জন্মের ধাক্কা! নির্ঘাৎ।

উনি প্রস্তুত হন্। শেষ চীৎকার ছাড়েন, সেই প্রথম জার্ম্মান্‌টার মতো—মর্‌তে হলে বীরের মত মরাই বাঞ্ছনীয়!

"হেই—হেই—হেই........"

চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে চরম বাক্যটা আর মনে পড়েনা তাঁর। "ঐ যা, ভুলে গেছি—কী লোক্‌টার নাম রে? ঐ যা বলে' চ্যাঁচায় রে গোব্‌রা?"

গোব্‌রাও ভুলে মেরে দিয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, এরকম অবস্থায় বাপের নামই ভুলে যায় মানুষ। নিজের নামই মনে রাখ্‌তে পারে না।

"তখনই বল্লাম তোকে মুখস্ত করে' রাখতে—"

"আর মুখস্ত করে কী হবে দাদা? এরা তো ওনাম মান্‌বে না, এরা যে তার উল্‌টো দল—"

"তা হোক্ গে! তবু মুখ বুজে বেড়ালের মতো মারা

যাবো, সেটা কি ভালো? বীরের মত মর্‌ছি যে এদের সেটা জানান্‌ দিতে হবে না?"

গোবর্দ্ধন মাথা চুল্‌কায়, দাদার পিছনে দাঁড়িয়ে।

হর্ষবর্দ্ধন যেন একটু আলো ছাখেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কথাটার শেষের আধখানা হচ্ছে 'লার'—এখন আগের আধখানা হলেই হয়ে যায়। "ঐ যা মাথায় পরে রে, —সাহেবরাও পরে, মেম্‌রাও পরে। বল্‌না গোব্‌রা!"

হর্ষবর্দ্ধন 'হ্যাট্‌' কথাটাকেই মনের মধ্যে হাত্‌ড়ান্‌।

"মাথায় পড়ে?" গোবরা মাথা ঘামায়। "মাথায় কী পড়ে? বৃষ্টি? বাজ? তা নয়? বোমা? তাও না? তবে কি—কাকের গু? উঁহু? কম্ফটার, পাগ্‌ড়ী? পাগ্‌ড়ী তো মাথায় বাঁধে। মাথায় পড়ে বল্‌ছ? তাহলে—তাহলে কি ইঁট?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এই বার হয়েছে—হে-হে-হেল্‌ ইঁট্‌লার!" হর্ষবর্দ্ধন লাফাবার জন্য লাফিয়ে ওঠেন! "হেইল—"

গোবর্দ্ধনের খট্‌কা লাগে: "দাদা, মর্‌বার সময়ে আর বিলিতি দেব্‌তা কেন? আমাদের দিশী দেব্‌তা কি নেই?"

"এতো কোনো দেব্‌তা নয়—অবতার কেবল।"

"আমাদের দিশী অবতার কি নেই—কেন, মহাত্মা গান্ধী?"

কথাটা দাদার মনে লাগে, সত্যিই তো, আর্য্যসন্তান তিনি, অনার্য্য অবতারের নাম কেন তাঁর মুখে? মরতে হয়তো

গান্ধির নাম মুখে নিয়েই তিনি মর্‌বেন। পা বাড়িয়ে, পদস্খলন ও অকাল মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়ে, তিনি ডাক ছাড়েন, গগণভেদী ডাক: "মহাত্মা গান্ধিজীকি জয়! মহাত্মা গান্ধি—"

গোব্‌রা ফোঁপাতে সুরু করে: "দাদা! দাদা গো!—"

"ছি, গোব্‌রা, কাঁদেনা, ছি!"

"ডাক্‌বো তোমায় সেই বলে'?—যা বলেছিলে তুমি?" দাদার শেষ বাসনাটাই বা কেন অপূর্ণ থাকে? গোব্‌রা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই চ্যাচায়—"হেই হাবাড়ডান্‌!

হর্ষবর্দ্ধনও কেঁদে ফ্যালেন, তাঁর গলা ফেটে আর্ত্তনাদের সুর বেরয়: "—গান্ধিজীকি জয়!

এবং প্রায় লাফিয়ে পড়েন তিনি—,

এমন সময়ে, বডিগার্ডরা পিছন থেকে এসে চেপে ধরে তাঁকে—"ষ্টপ্‌ ষ্টপ্‌! আর ইউ ইণ্ডিয়ান্‌? নট্‌ নিগ্রো?"

বাধা পেয়ে ভড়কে যান্‌ হর্ষবর্দ্ধন।

"আর ইউ গান্ধিষ্ট? আর ইউ হিণ্ডুজ্‌?"

গোবর্দ্ধন বলে: "অফ্‌কোর্স।"

"দেন্‌ ডোণ্ট্‌ জাম্প্‌! গো অ্যাওয়ে! ফ্রি ইউ আর্‌!"

দুভাইকে ওরা বহিষ্কৃত করে দ্যায়—নগরের বাহিরে। সেই রাত্রেই। চারিদিকে খানা-খন্দ, ট্রেঞ্চ, আর কাটা খাল্‌ —অন্ধকারে কোথায় পা বাড়াবেন? অগত্যা, গোবর্দ্ধন চাপে

এক গাছে,—আরেক গাছে হর্ষবর্দ্ধন তাঁর দেহভার রক্ষা করেন। রাতটা কাটাতে হবে এই ভাবেই।

হর্ষবর্দ্ধনের গাছটায় হেলান্ দেবার সুবিধা ছিল। ওরই ফাঁকের মধ্যে, কাৎ হয়ে, কাকনিদ্রার সুযোগে, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন তিনি—

একবার দেখ্‌লেন, তিনি খুব বুড়িয়ে গেছেন, যেন মহা বৃদ্ধ পিতামহ আর কি! আর গোব্‌রা গেছে নেহাৎ বাচ্ছা বনে'—সেই বাল্যকালের সেকেলে গোবরাটি যেন!

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম-পিতা হয়ে গোবর্দ্ধনকে তিনি সম্বোধন কর্‌ছেন: "বৎস গোব্‌রা। যুদ্ধবিগ্রহে কাজ নেই, ফিরে যা তুই—! তোর কথাই ঠিক্! মর্‌বার পক্ষে স্বদেশই ভালো। এমনকি, বাঁচবার পক্ষেও খুব মন্দ না।"

আরেকবার দেখ্‌লেন, গোব্‌রার বৌদিকে। তিনি যেন সিংহাসনে বসে রাণী সেজে কোর্ট্‌মার্শাল্ কর্‌ছেন, লা পাসানোরিয়ার মতই—আর তাঁর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে পাগ্‌ড়ি-বাঁধা কে ঐ লোকটা? জেনারেল্ ফ্রাঙ্কোই যেন স্বয়ং? কী সর্ব্বনাশ!

এবার হর্ষবর্দ্ধনের এমন চমক্ লাগে যে গাছ থেকে প্রায় পড়ে যান আর কি!

ঘুম ভেঙেই তিনি চোখ কচ্‌লে তাকান চারিদিকে। নাঃ, দুঃস্বপ্নই। তবু রক্ষা! আরামের নিশ্বাস পড়ে ওঁর।

কিন্তু ওটা কি তাঁর সাম্‌নে—ঐ মাটিতে পড়ে? চোখ কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে?

কোনো বোমাটোমা নয়তো? এখানে এবং এখুনি ফাটে যদি, তা হলেই তো সাবাড় করেছে; তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা—দুজনেই কাবার্‌ তাহলে।

হর্ষবর্দ্ধন আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামেন। ওটাকে নিরাপদ ব্যবধানে ছুঁড়ে ফেলাই ভালো। অমন করে' চোখ পাকিয়ে অত কাছাকাছি ওটা থাক্‌তে ওঁর স্বস্তি নেই!

হর্ষবর্দ্ধন নেমে ওটাকে ধরে—যতখানি হাতের জোর ছিল সব দিয়ে—যত সুদূরে সম্ভব ওটাকে বিদূরিত করে আবার গাছের ডালে এসে বসেন। নিরাপদে।

এদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সেই রাত্রেই ম্যাড্রিড্‌ দখলের মৎলব করেছিলেন। তিনি গুটিসুটি মেরে অগ্রসর হচ্ছিলেন সদলবলে—আচম্‌কা ম্যাড্রিডের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেন এই দুরভিসন্ধি। হর্ষবর্দ্ধন যখন গাছ থেকে নেমে হাতের জোর ফলাচ্ছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তারা তাঁর একশ হাতের মধ্যে—তাঁর হাতের কস্‌রতের কাছাকাছি—কাছিয়ে এসেছিল—

এবং হর্ষবর্দ্ধন যাকে বোমা মনে করে' বিতাড়িত করলেন, সেটা আর কিছু না, প্রকাণ্ড এক বোল্‌তার চাক্‌—

চাক্‌ভাঙা বোল্‌তার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল গিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলে। তারপরেই বাধ্‌লো বিভ্রাট্‌।

গৃহহারা হয়ে ভীষণ ক্ষেপে গেল বোল্‌তারা, কাণ্ডা কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল তাদের, যাকে তাকে কাম্‌ড়াতে সুরু করে' দিল তারা। যাকে সাম্‌নে পেল তাকেই হুল্‌ দিয়ে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। অসঙ্কোচেই।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো সসৈন্যে বিচলিত হয়ে পড়লেন! এক মুহূর্ত্তেই। চোখে দেখা যায় না, গুলি করে ঠেকানো যায় না—অথচ সঙ্গীন দিয়ে বিঁধ্‌চে—এসব কোন্‌ শত্রু? আর কী জ্বলুনি তাদের কামড়ে!

সৈন্যেরা সব লাফাতে সুরু কর্‌ল। বন্দুক টন্দুক ফেলেই এমনকি, জেনারেল বলে' ফ্রাঙ্কোকেও রেয়াৎ করল না বোল্‌তারা। প্রায় গোটা সত্তর সেঁধিয়ে পড়ল তাঁর প্যান্টের ভেতরে। তাঁকেই পালের গোদা বলে' কি করে' যেন জেনেছিল তারা।

ফ্রাঙ্কো চেঁচাতে সুরু করলেন, ফ্র্যাঙ্ক্‌লিই তিনি বল্লেন: "বোল্‌তাদের সঙ্গে লড়াই করা আমার সাধ্য না! ম্যাড্রিড্‌ মাথায় থাক্‌, আমি আর এর ত্রিসীমানাতেও নেই!"

জেনারেল ফ্রাঙ্কো পিট্‌টান দিলেন। সসৈন্যে—সেই দণ্ডেই। প্রায় পঞ্চাশ মাইল তাদের তাড়িয়ে নিয়ে রেখে এল বোলতারা—তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল তারা—কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে দাঁত ব্যথা—হুল্‌ ভোতা হয়ে গেল তাদের। জেনারেল ফ্রাঙ্কো তখনো অক্লান্ত ছুট্‌ছেন। সদলবলেই। বীরদর্পেই।

উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে, একদা, জেনারেল ফ্রাঙ্কো,

সসৈন্যে, ম্যাড্রিড্ অবরোধ করে, বিনা বিরোধেই হঠাৎ বহু দূরে সরে পড়েছিলেন, খবরের কাগজের মারফতে এ খবর তোমরা পেয়েছ। কিন্তু তাঁর এই অভাবিত সুদূর গতির মূলে যে কোন্ দুর্গতি ছিল এবং সেই দুর্গতির মূলে হর্ষবর্দ্ধন কতখানি, তা তোমরা জান্‌তে পেলে এতদিনে।

ফ্রাঙ্কোর বিরাট্ পলায়নের কীর্ত্তি পরদিনই জান্‌লে ম্যাড্রিড্-বাসী। কারণটাও টের পেল ক্রমশঃ। তারপর অচিরেই একদিন হর্ষবর্দ্ধনকেও আবিষ্কার কর্‌ল তারা। আর কী অভিনন্দনটাই না দিল তাঁকে! গোবর্দ্ধনও বাদ গেল না, বলাই বাহুল্য! স্বয়ং রিপাব্‌লিকের প্রেসিডেণ্ট হর্ষবর্দ্ধনের করমর্দ্দনে পুলকিত হবার জন্য হাত বাড়ালেন—তাঁর নিজের প্রাসাদে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' এনে—

কিন্তু সে আরেক গল্প!

———

স্যাঙাতের সাক্ষাৎ

(সত্য ঘটনা !)

যখনই আমি সে কথা ভাবি তখনই রবীন্দ্রনাথের গানের একটা প্রসিদ্ধ লাইন্ আমার মনে পড়ে: 'কত অজানারে জানাইলে তুমি !'

এবং সেই সঙ্গে—'কত ঘরে দিলে ঠাঁই'। ভাব্‌তেও হৃদ্‌-কম্প হয়।

দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়ীটাই পছন্দ করলাম। চেঞ্জে গিয়ে, যদি সহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদ্‌লানো কী? তোমরাই বলো!

বাড়ীটা বেশ বড়োই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পোড়ো বাড়ি নাকি!—বলছিল কে। আমার বিশ্বাস হয় না। সহরের সুখ সুবিধা ছেড়ে, এতদূরে, মাঠের মধ্যিখানে, কে আর বাড়ী ভাড়া করতে আস্‌বে বলো? সেইজন্যই ভুতুড়ে বাড়ি বলে' সুখ্যাতি রটেছে, তাছাড়া আর কি? অন্ততঃ, আমার তো তাই মনে হোলো।

আমার বেশ পছন্দই হয়েছে বাড়ীটা! আমিও একা, বড়ীটাও একাকী, সন্ধ্যার মুখেই আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়ে গেল।

দীর্ঘকালের ধূলো আর মাকড়সার জাল ভেদ করে' ঢুকলাম তো বাড়ীর মধ্যে। ভূতের আস্তানার মতই হয়ে আছে বটে! ঘরদোরের কেউ কোনদিন যত্ন নেয়নি, এবাড়ীর যে কখনো ভাড়াটে জুট্‌বে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেবিল, চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আল্‌মারি, খাট, তোষক, বিছানা, পাপোষ—আসবাবের কোনো কিছুরই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ-সব। ভুতুড়ে বাড়ী বলে কেউ আস্‌তে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়েও, সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক্‌, নিজেই সব ঠিকঠাক্‌ করে' নেব। আজ তো নয়,—সেই কাল সকালে সে-সমস্ত। এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে-ঝুড়ে নিজের বিছানাটা পেতে, আজকের রাত্রের মতো ব্যবস্থা করে' নিতে পারলেই হয়।

আপাততঃ তাই করা গেল। কিন্তু ঘরের মেঝেতে জমে রইল বহুদিনের জড়ো করা ধ্‌লো। চারিধারের পুঁজি-করা ধ্‌লোবালি-জঞ্জালের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। কিন্তু কি আর করা যাবে? এখন রাত্রের মুখে একা একা এত পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

এক ভৌঁতে হাত কোলাকুলি করবার জন্য লাফ দিতে

আলো জ্বাল্‌লাম। উস্‌কে দিলাম ওর শিখাটা।

তারপর বিছানায় গিয়ে লম্বা হলাম। অবশ্যি, ঘুমোবার সময় হয়নি এখনো, সবে মাত্র, সন্ধে উৎরেছে বল্‌তে গেলে, তবু একটু গড়িয়ে নিতে ক্ষতি কি?

বিছানায় গড়াতে গিয়ে কখন যে নিদ্রার কোলে ঢুলে পড়েছি নিজেই জানিনে। হঠাৎ এক ঝট্‌কা আওয়াজে চট্‌ করে ভেঙে যায় আমার চট্‌কা। বুক ধড়াস্‌ করে' ওঠে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসি বিছানায়, দেখ্‌তে পাই—

দেখ্‌তে পাই, এক হাস্য-বিকশিত বদন এবং এক জোড়া পরিপুষ্ট হাত কোলাকুলি করবার জন্য লালায়িত।

কে এই ভদ্রলোক? আশপাশের কোনো বাসিন্দে বোধ হয়? নতুন ভাড়াটের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভদ্রতা জানাতে এসেছেন হয়তো!

কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা উচিত হবে, ইত্যাকার চিন্তা কর্‌ছি মনে মনে, এমন সময়ে ভদ্রলোক বেমালুম মিলিয়ে যান্‌!

আমার চোখের সাম্‌নেই, চকিতের মধ্যেই!

য়ঁ্যা? এ কি হোলা—?

দৃষ্টির বিভ্রম, নিতান্তই! তবু বুকটা ধর্‌ধর্‌ করতে থাকে!

বিছানা ছেড়ে, আস্তে আস্তে ইজি চেয়ারটায় বস্‌লাম গিয়ে!

বাতিটা দিলাম আরো উস্‌কে।

চারিধার নির্জ্জন আর নিস্তব্ধ।

আপনা থেকেই কেমন গা ছম্ ছম্ কর্‌তে থাকে। মনে হোলো আমি যেন কবরের মধ্যে প্রবেশ করেছি, যারা মরে গেছে তাদের শান্তিভঙ্গ কর্‌তে এসেছি আমি।

চিন্তাটাকে অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা কর্‌লাম। যে সব দিন চলে গেছে তার মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে ফিরিয়ে আন্‌তে চাইলাম। কত পুরাণো দৃশ্য, আধভোলা মুখ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর কত গান যা আগে লোকের গলায় গলায় ছিল কিন্তু আজকাল কেউ গায় না আর—যারা প্রিয়জন হতে পারত অথচ ভাব হোলো না যাদের সঙ্গে—ইত্যাদি—ইত্যাদি—

তাড়কা রাক্ষসী তাড়া কর্‌বে নাকি ?

ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে কাটালাম। নিঃসঙ্গতার বোধ ক্রমশই আমাকে আচ্ছন্ন করে' এল। বাতি নিবিয়ে, আস্তে

আস্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। অমার মনে হতে লাগ্‌ল যেন তাড়কা রাক্ষসী ঘুমিয়ে আছে ঘরে—জেগে উঠে এক্ষুনি তাড়া কর্‌বে আমায়। তার তাড়না যেন চোখের উপর ভাস্‌তে লাগ্‌ল কিম্বা কুম্ভকর্ণই কে জানে, হঠাং জেগে উঠবে, যার ঘুম ভাঙ্‌লেই সর্ব্বনাশ!

এর মধ্যে কখন্ বৃষ্টি পড়্‌তে স্বরু করেছে, বাতাস সোঁ সোঁ কর্‌ছে, আমি শুয়ে শুয়ে তাই শুন্‌তে শুন্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে; সব নীরব নিস্তব্ধ কেবল আমার আর্ত্তহৃদয় বাদে,—তার গুড় গুড় আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুন্‌ছিলাম। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বলটি আস্তে আস্তে, কথা নেই বার্ত্তা নেই, পায়ের দিকে সরে যেতে স্বরু কর্‌ল, কেউ সেধার থেকে টান্‌ছে যেন। আমার নড়্‌বার চড়্‌বার—এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্য্যন্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এস্তক্ খালি হোলো কম্বল সর্‌তেই থাক্‌লেন। কি আর করি আমি? ভদ্রতা আর চলে না দেখে, টানাটানি স্বরু করে' দিলাম। অনেক ধস্তাধস্তি করে' কম্বলকে ধরে' এনে আপদ-মস্তক ঢেকে দিলাম আবার।

আমি কাণ পেতে প্রতীক্ষায় রইলাম। কী হয় দেখি! আবার কম্বল সর্‌তে স্বরু হোলো। এবার পা-বরাবর গিয়ে পৌঁছল। আবার তাকে পা থেকে টেনে আন্‌লুম। এম্‌নি করে' অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অদৃশ্য টাগ্ অব্ ওয়ার্

চল্‌তে থাক্‌ল। যখন তৃতীয় বার কম্বল সরে গেল তখন টান্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হোলো আমার। এবার কম্বলটা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অস্ফুটধ্বনি কর্‌লাম। পায়ের কাছ থেকে প্রতিধ্বনির মতো সেই স্বরে প্রত্যুত্তর এল। আমার কপাল ঘেমে উঠল। মনে

আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি

হোলো যা বেঁচে আছি তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে মারা গেছি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতীর পায়ের মতো একটা থপ্ থপ্ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—মানুষের পায়ের শব্দ কখনই অমন হতে পারে না, অবশ্য অতি মানুষের কথা বল্‌তে পারিনে! থপ্ থপে আওয়াজটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, শুন্‌লাম,—হুড়কো এবং দরজা না খুলেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মনসিক উত্তেজনা শান্ত হলে, আমি স্বগতোক্তি কর্‌লাম, এ হচ্ছে স্বপ্ন,—স্বপ্নই—ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। ভাবতে চেষ্টা কর্‌ছি যে, হয় এ বিভ্রম নয় শুধু স্বপ্ন, তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোকে যেমন করে' থাকে তেমনি হটাৎ হাস্‌তেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুন্‌তে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ীর আর সব ঘরের দরজা জান্‌লা জোরে খুল্‌ছে আর বন্ধ হচ্ছে। এও কি মতিভ্রম? আমারই?

চট করে' উঠে আলোটা জ্বাল্‌লাম। জ্বেলে দেখি আমার ঘরের দরজা আগের মতই বন্ধ রয়েছে, অকস্মাৎ খুলবার ও বন্ধ হবার কোন অভিসন্ধি নেই তার। তখন আরামের নিশ্বাস ফেলে, সিগারেট ধরিয়ে আমার ডেক্ চেয়ারটায় এসে বস্‌লাম।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আমার পিলে পর্য্যন্ত চম্‌কে উঠল। সিগারেট খসে পড়্‌ল মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাসও ভারি সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার! এ কি! ঘরের পুঞ্জীকৃত ধুলোর উপরে আর পায়ের দাগের পাশাপাশি—! এ কার

আবার? আরেক পায়ের দাগ, এত বড়ো যে তার তুলনায় আমার পায়ের দাগ নিতান্তই শিশুর বলে সন্দেহ হয়।

কিছু পূর্ব্বে যে-বন্ধুটি কম্বল টানাটানি করে' গেছেন এ কি তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন?

ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপনা থেকেই নিবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে' অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে' পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হোলো, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আস্‌ছে, কিন্তু ঘরের যে-জানালাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্তই খাটো বলে' কিছুতে গলতে পারছে না তা' দিয়ে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লুম—"বন্ধু, তোমার ঐ গোদা পা নিয়ে আর এ ঘরে এসো না, বেজায় স্থানাভাব।"

কিন্তু সে যে আমার আপত্তিতে কর্ণপাত করেছে এমন মনে হল না।

খানিক পরে পরে, একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একটু ইতস্ততঃ করে, যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। আমার বিছানার চার পাশে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ শুনতে পেলাম, ভারী নিশ্বাসের শব্দ, অদৃশ্য পাখার ঝটাপট্ আর কি রকম একটা গুম্‌রানো গোঁয়ানো ধ্বনি। মহা মুস্কিলেই পড়া গেল তো! কেননা আমার স্পষ্ট বোধ হোলো ঘরে কারা যেন এসেছে, আর আমি নিঃসঙ্গ নই।

মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে, অবশ হয়ে আসে দেহমন। ভারী ভয় ভয় করতে থাকে, তারি ফাঁকে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। তন্দ্রার ঘোরে দেখতে পাই, বিকটাকার' এক ব্যক্তি কচ্ছপের পিঠে চেপে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

আরোহীর ভারী তাড়া, কিন্তু বাহকের গরজ নেই মোটেই। তিনি চান্ তাকে ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে ছোটাতে, অথচ সে-বেচারী ধীরে সুস্থে নড়াচড়া করার পক্ষপাতী। বনেদী চালচলনেই চিরদিন অভ্যস্ত সে।

অবশেষে, সেই অদ্ভুত লোকটি ক্ষেপে যান্। হ্যাঁ, অদ্ভুতই বলতে হবে ভদ্রলোককে। একজোড়া শিঙ এবং আরেক জোড়া গজদন্তে তাঁর চেহারার যথেষ্ট খোলতাই হলেও, টেনে হিঁচড়েও, কিছুতেই, সুপুরুষ বলা চলে না তাঁকে।

ভদ্রলোক তো রেগে মেগে, কোত্থেকে একটা বাটালি আর হাতুড়ি যোগাড় করে' এনে, কচ্ছপটাকে দেগে দিতে সুরু করেন—সশব্দে। বেশ সোর গোল করেই।

তাঁর হাতুড়ির আওয়াজে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। আমি আশা করেছিলাম, অতিকায় কচ্ছপটাকে আমার বিছানার কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাবো। বাতির অর্দ্ধস্পষ্ট আলোতেই, যতদূর সম্ভব, চারিধার খুঁটিয়ে দেখলাম, না, কচ্ছপ বা তাঁর আনুসঙ্গিক অপর কারোরই উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম না। যাক্, তবু বাঁচোয়া!

আমার অভ্যন্তর ভেদ করে' একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে গেল। ভয়ানক অসুবিধার মধ্যেও।

ঈষৎ উজ্জ্বল কি যেন একটা পড়ল বালিসে। তুফোটা আবার পড়ল আমার মুখে, পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে মুখময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরেই দেখতে পেলাম আবছা

কচ্ছপটাকে দেগে দিতে সুরু করেণ

আবছা মুখ, সাদা হাত যেন বাতাসে ভাসচে, এই ভেসে উঠচে এই মিলিয়ে যাচ্ছে! বুঝলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু; অবশ্য মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশী বাঞ্ছনীয়! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আস্তে

আস্তে যেমন উঠতে গেছি, কার চ্যাপটা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত মিলনের জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। ধড়াস্ করে' আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তার খানিক বাদে বোধ হোলো একটা কাপড় চোপড়ের খস্ খস্ শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আবার সব চুপ্‌চাপ্! কতকালের রোগীর মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লাম। কম্পিত হাতে বাতি জ্বাল্‌লাম আলো জ্বেলে, ধুলোর পরে যে ভয়ানক সব পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা করচি; হঠাৎ বাতি যেন নিবু নিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্ত্তে আবার সেই হাতীর পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলাম। শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা করবার অজুহাতেই চম্‌কে থেমে গেল হঠাৎ। বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসে হঠাৎ কেমন নীল আলো বিকীরণ করে' নিব্‌ল কিনা জানিনা, সমস্ত ঘরটা ছায়াপথের আলোতে ভরে উঠ্‌লো।

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝট্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার গালে এসে লাগ্‌ল। আমার সাম্‌নে বাষ্পময় কি একটা যেন খাড়া হয়ে রইল। দারুণ অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু কী যে করব—!

প্রথমে একটা হাত তারপরে দুটো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, মায় এক বিষণ্ণ বদন, ক্রমশঃ সেই বাষ্প থেকে

আত্মপ্রকাশ করল। দেখলাম আমার সামনে এক প্রায়-নগ্নকায় প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা সটান্ দাঁড়িয়ে রয়েচে।

লোকটার বি ভয় দূর হোলো, মনে হোলো এ কোন ক্ষ ক্ষতিজনক ভূত এ নয়

সাম্‌নে এক প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা দাঁড়িয়ে রয়েছে

বোধ হয়? আমার স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভূতটাকে কাছে পাওয়া গেল—

এ ভালোই। খুসীই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় হঠাৎ আত্মীয় পাওয়ার মতোই—আর কি!

আমি তাকে অভ্যর্থনা করে' বল্লাম—"কে হে তুমি? তুমি কি জানো যে আমি দু তিন ঘণ্টা যাবৎ মুমূর্ষ্ হয়ে রয়েছি? যাক্ তোমাকে দেখে খুসীই হওয়া গেল! আমার যদি একটা চেয়ার থাকতো, অবশ্য তোমাকে ধারণ করবার মতো—আহা, থামো, থামো, ঐ জিনিষটির উপর বসে' পোড়ো না যেন!"

কিন্তু কাকেই বা বলা! ততক্ষণে অমন দামী চেয়ারটিতে সে বসে' পড়েছে, চেয়ারটিও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেল।

"দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি সবই ভাঙবে দেখ্‌চি—"

বলা বাহুল্য! ইজিচেয়ারটিরও সেই দুর্দ্দশা!

"তোমার ঘটে কি বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নেই? ঘরের সব জিনিষ-পত্তর ভেঙে কি তছ্‌নছ্‌ করতে চাও তুমি? করো কি, করো কি, সর্ব্বনাশ—"

বলা নিস্ফল! তাকে বাধা দেবার আগেই সে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে। বিছানাটাও চেয়ারগুলোর সঙ্গী হোলো। কি ভয়ানক!

"এটা কি রকম ভদ্রতা হচ্ছে শুনি?" এবার দস্তুরমতো চটেই উঠলাম আমি, "প্রথমে তো হাতীর মতো গোদা পায়ের শব্দে ভয় দেখিয়ে, প্রায় মরি আর কি, সেটা নাহয় সহ্য করা গেল, কিন্তু এখন এসব কি হচ্চে কী? বায়স্কোপের

পর্দ্দাতেই এরকমের রসিকতা বরদাস্ত করা চলে, লরেল্-হার্ডির ছবিতেই কেবল! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বোঝবার মত বয়েস হয়েছে তোমার। নেহাৎ ছেলেমানুষটি নও তো!"

"আচ্ছা আর আমি কিছু ভাঙ্ ব না। কিন্তু কি করব বলো, একশ বছর ধরেই আমি হাঁট্ছি, কেবল হাঁট্ছি, একদণ্ড কোথাও বসতে পাইনি য়্যাদ্দিন!"

তার চোখ থেকে দরবিগলিতধারে অশ্রুপাত হতে থাকে।' ভূতের চোখে জল! এ যে রাম-নামের মতই অভাবনীয় ব্যাপার! বেচারী ভূত! আমার দুঃখ হোলো দস্তুরমত।

আমি বল্লাম, "আমার রাগ করা উচিৎ হয় নি সত্যি তুমি যে একটি বাপমাহারা সত্যি অনাথ বালক তা কি আমি জানি? তা কি করবে, এই মাটিতেই বস,--কিছুই তোমার ভার সইবে না যে! নইলে হয়ত কোলে করেই বসতুম তোমার হ্যাঁ, সামনে ঐখানটাতেই! তাহলে এই চেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা কইতে পারবো।"

সে মাটিতেই বসে পড়্ল। আমার দামী কম্বলটা সে ঘাড়ে ফেল্ল এবং বিছানাটাকে জড়িয়ে মাথায় পাগ্ড়ীর মত করে' বাঁধল। তখন তার আয়েস্ একটা দেখবার মতো!

"ভালো কথা, এত হাঁটাহাঁটি কর্‌ছ কেন তুমি?" আমি জিজ্ঞাসা করি। "পাছে বাতে ধরে সেই ভয়ে?"

"আর কেন? খবর পেলাম কোথায় নাকি আমার ষ্ট্যাচু

খাড়া করা হয়েছে? ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, এই ঠিক আমার মতোই—ঘোড়ার উপর বসানো। আমার সেই পাথুরে চেহারা দেখ্‌তেই আমি বেরিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে রয়েছে, তাই খুঁজে পাচ্চিনা!"

"ভাবনার কথাই তো বটে।" আমি বলি, "নিজের চেহারা নিজে না দেখতে পাওয়ার মতো দুঃখ কি আছে! তা এক কাজ করনা কেন? এত না হেঁটে, একটা ঘোড়া টোরা নিলেও তো পারো। ঘোড়ায় চেপে—"

সে বাধা দিয়ে বলে—"ঘোড়ার কথা আর বোলো না! ওরা জ্যান্ত অবস্থাতেই ঘোড়া, একবার মর্‌লে একেবারে গাধার অধম! মরা হাতীর দাম সোয়া লাখ হতে পারে কিন্তু মরা ঘোড়ার দাম এক কাণাকড়িও নয়!"

"মরা ঘোড়া কি হবে?" আমি ঠিক বুঝতে পারি না— "কী দরকার তার?"

"আহা ঘোড়ারাও মরে' ভূত হয় যে। কিন্তু ভূত হয়েও সেই যে-ঘোড়া সেই ঘোড়াই থাকে। হুবহুব্! যাই মরুক্, মারা যাবার পর, সূক্ষ্ম শরীরে ঠিক সেই চেহারাতেই থেকে যায়, একটুও অদল বদল হয় না। এমনকি টেবিল চেয়াররা পর্য্যন্ত মরে ভূত হয়!

"বলো কি!"

"তাই বলি! বিশ্বাস না হয় বিভূতি বাঁড়ুজ্যেকে জিজ্ঞেস্ কোরো!"

"আচ্ছা, করব এখন, কলকাতায় ফিরে। অবশ্যি যদি ফেরবার সাবকাশ পাই, তুমি দয়া করে ফিরতে দাও যদি! তারপর, হ্যাঁ, ঘোড়ার কথা কী বল্‌ছিলে ?"

আমি ঘোড়াটাকে অনেক করে বোঝাই

"এক বেটা ঘোড়াকে, মানে ঘোড়ার ভূতকে বহুৎ বলে' কয়ে' রাজিও করেছিলাম, কিন্তু শেষটায় সে বিগ্‌ড়ে

গেল হঠাৎ!" তার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ আর বিরক্তি প্রকাশ পায়: "একেবারে বেঁকে বস্‌ল আর বল্‌ল যে সারাজন্ম ছুটোছুটি করেই মরেছি এখন মরে গিয়েও সেই ছুটোছুটি? একটু জিরোতে পাবনা?"

"তারপর—?"

"আমি তাকে অনেক করে' বোঝাই, বলি যে আমার মতো তোরও ষ্ট্যাচু বসিয়েছে তারা, খবর পেয়েছি আমি। আমাকে কিনা, তারা, সেখানেও, তোর পিঠেই চাপিয়ে রেখেছে- সেই জন্যেই তো তোর পিঠে চেপেই আমি যেতে চাই!—এই না যেই শোনা, ঘোড়াটা চটেমটে এমন চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে যে, ঘোড়ায় চাপার বায়না রেখে দিয়ে সোজা পদব্রজেই আমি বেরিয়ে পড়ি!"

আমি সহানুভূতি জানাই—"ভারি মুস্কিলের কথা! এত বেশী বয়সে এতখানি হাঁটাহাঁটি কি পোষাবে তোমার? তার চেয়ে এক কাজ করলে তো পারো। রেলে যাতায়াত করলেও তো পারো। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে!"

"হেঁটেই মেরে দেবো। রেল আবার কেন?"—সে আশঙ্কা প্রকাশ করে, "রেলে ভারি কাটা পড়ে লোক, ভারি কলিশন্ হয়! সেই ভয়েই তো রেলে চাপি না।"

"তা, চাপোনা যে ভালোই করো!" ওর কথায় আমি সায়

দিই। "ওতে খরচাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদ্দিন তুমি এই রকম পায়চারি করছ পৃথিবীতে?"

"পৃথিবীতে? তা প্রায় একশ বছর।" সে জবাব দেয়—"পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও।"

"পৃথিবী ছাড়িয়েও কি রকম?" আমি অবাক হই, "অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার?"

"আহাহা! তা কি আমি বলেছি? আর, সে সব জায়গায় যাবই বা কেন? তারা কি আমার ষ্ট্যাচু খাড়া করেচে?"

"তবে পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম?"

"যোগবলে। আকাশ-পথেও চলা ফেরা করতে পারি কিনা আমরা। অনেক সময়ে, মাটির থেকে দুহাত, আড়াই হাত, পৌনে চার হাত পর্য্যন্ত ওপরে উঠি!"

"বলো কি?"

"ওই রকম।" সে ব্যক্ত করে—"যোগের মজাই ওই! মরলে মানুষমাত্রই এই যোগবল লাভ করে, অনায়াসেই! আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকতে পারলে, জীবনেও অনেক সময়ে লাভ করা যায়।"

"হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে।" আমার অন্তরাত্মা অকস্মাৎ জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে: "আচ্ছা তোমাদের জন্যে, মানে যারা অক্কা পেয়েছে তাদের জন্যে, ঐ সূক্ষ্ম অঞ্চলে, কোথায় না কি একটা জায়গা আলাদা করে' ইজারা দেওয়া আছে—নয়

কি? প্রেতলোক ট্রেতলোক ঐ গোছের একটা জম্‌কালো নামটাম হবে?"

"হ্যাঁ, শুনেছি। দূর থেকে দেখেছিও। কিন্তু সেখানে ঢুক্‌তে পাইনি আমি।"

"কেন! তুমি কি মারা যাওনি তবে? আমার তো মনে হয় যথেষ্টই মারা গেছ।"

"হ্যাঁ, মারাও গেছি এবং ভূতও হয়েছি, কিন্তু ভূতেরও আবার জাতিভেদ রয়েছে কিনা! যারা বংশ রক্ষা করে' জলপিণ্ডের ব্যবস্থা রেখে মরেছে তারাই কেবল ঐ প্রেতের স্বর্গে পাত্তা পায়। সেখানে তারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করে—সাত পুরুষ পর্য্যন্ত!"

"বটে বটে!" আমার কৌতুহল হয়—"কি রকম শুনি?"

"কি রকম আর! ঠিক পুরুষানুক্রমে। এই পৃথিবীতে যেমন! এ ওর ঘাড়ে সে তার ঘাড়ে—এই রকম সাত পুরুষ! সে এক ইলাহি ব্যাপার। অবশেষে যখন আর ভার সয় না ব্যালান্‌স্ থাকে না কিছুতেই, তখন সবার ওপরের যিনি, অতি প্রবৃদ্ধ প্রপিতামহ, সবার আগে যিনি পৃথিবীতে খতম্ হয়ে ছিলেন,তিনিই প'ড়ে গিয়ে জখম্ হন্। এমন কি, সেই আঘাতে, প্রায়ই তিনি মারা যান্।"

"বলো কি! ভূতের আবার মরণ আছে নাকি?"

"আছে বই কি! অপঘাত মৃত্যু নেই কার! আর প্রেত-

লোকে মারা গেলেই পৃথিবীতে জন্ম হয়। যেমনি ঘাড় থেকে ভূমিসাৎ হওয়া আর অমনি ভূমিষ্ঠ হওয়া !"

সে এক ইলাহি ব্যাপার

"আশ্চর্য্য ! তা তোমাকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন ?"

"আমি যে বংশ রক্ষা করে মরতে পারিনি, মারা গেছি

একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিশে, উপায় নেই আর! আমি ওখানে ঢুক্‌তে পেলে তো একেবারে অমর হ'য়ে খুঁটো গেড়ে বসবো কি না! আমার পিছনে তো বংশ নেই। আমার পরে তো কেউ আস্‌ছেনা আর। তবে আর আমাকে ঠেলে ফেল্‌বে কে? সেই ভয়েই তো তারা ঢুক্‌তে দিচ্ছে না আমায়।"

"তাহলে ভারী মুস্কিল তো! কী করবে তুমি তবে? তোমার তো তা হলে পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কাও নেই আর?

"কী আর করবো! পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছি তাই। ভাবছি আত্মহত্যাই করব নাকি শেষে। তার আগে আমার সেই ষ্ট্যাচুটা একবার স্বচক্ষে দেখে—"

"ভূতেরা কি আত্মহত্যা করতে পারে?"

"কে জানে! চেষ্টা করে' দেখ্‌তে দোষ কি? কিন্তু তার আগে—

আমার মাথায় চকিতে বিজ্‌লী খেলে যায়, সেই যে কিছু দিন আগে খুব সোরগোল্‌ করে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ইনিই! ইনিই তবে! এ না হয়ে আর যায় না।

"ওঃ, এখন বুঝ্‌ছি—" হঠাৎ আমার টনক্‌ নড়েঃ "তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় হুবহুব্‌।"

"কি—কি?" কৌতুহলী হয়ে ওঠে—সে।

"কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড়ো বড়ো পায়ের দাগ দেখ্‌তে পাওয়া গেছল, যা-নিয়ে খবরের কাগজে কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল সেই সময়ে—এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি

সে-সব কার কীর্ত্তি !"

"কার ?"

"কার আবার ? তোমার।"

"তা হবে। বিষণ্ণ ভাবে সে ঘাড় নাড়ে—"খবরের কাগজও দেখিনি অনেকদিন !"

"দেখাতাম্ তোমায়, কিন্তু রাখিনি ত ! তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জান্‌ত কে ! জান্‌লে রাখ্‌তাম !" আমি বলি,—"কিন্তু বলো দেখি, আমার বাড়ীতেই পায়ের ধূলো দিলে কেন হঠাৎ ?"

"তোমার আস্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা !" সে বল্‌তে থাকে : "আর এই বাড়ীটায় আলো জ্বলছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখ্‌মাম তার সঙ্গে আমার নামের ভারি মিল ! ভাব্‌লুম আমারই আত্মীয় হয়তো, কিম্বা আমারই স্যাঙাত ট্যাঙাত কেউ হবে, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে নিই না কেন আমার ষ্ট্যাচুর ঠিকানাটা ! যাক্, তুমি যখন জানোই না, তখন আর বসে থেকে কি লাভ ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার।"

"সে কথা মন্দ নয় !"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বলি : "কিন্তু—"

সে সকরুণ চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে।

"তোমার নামটি কি তা তো বলে গেলে না ?"

"আমার নাম ? আউট্‌রাম।" সে বলে—"জাঁদরেল্ আউট্‌রাম ! বেঁচে থাক্‌তে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ। তখন জেনারেল বলে আমায় ডাক্‌ত সবাই। এ রকম অদ্ভুত নাম শুনেচ এর আগে ? অবশ্য তোমার নিজের নাম ছাড়া। আচ্ছা আসি তবে ! আসি ?—কেমন ?"

আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হবার আগেই আউট্‌রাম আউট হয়ে গেলেন। আমার লাল কম্বলটাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না।

———

বিপিনের পরিচয়সূত্র

সেদিন সকালে উঠে সবেমাত্র চায়ের জলের কেট্‌লিটা চাপিয়েছি, এমন সময় আমাদের বিপিন এসে হাজির। "কিহে যাচ্ছ নাকি ইডেন গার্ডেনে আজ?" চোখ কচ্‌লে দেখি, হ্যাঁ, বিপিনই তো—বিপিনেরই অভাবিত আবির্ভাব—অকস্মাৎ!

"ইডেন্‌ গার্ডেনে কেন আবার?" আমি অবাক্‌ হই।

"বা, ক্রিকেট ম্যাচ্‌ আছে যে!" সে বলে, "টেস্‌ট্‌ ম্যাচ্‌!"

"ওঃ!" আমার মনে পড়ে যায়। "কিন্তু টিকিট তো কেনা হয়নি ভাই!"

"আমার দুটো সীজন্‌ টিকেট রয়েছে। আরেকজন একটা বেশী কিন্‌তে বলেছিল কিন্তু তার পাত্তা পাচ্ছি না আর, তাই বাড়্‌তিটা তোমাকে গছাতেই এলাম!"

"তাই বলো!" এতক্ষণে আমি রুদ্ধ-নিশ্বাস পরিত্যাগের অবকাশ পাই। "তা নইলে কি বাড়ী বয়ে' আস্‌বার ছেলে তুমি! এই সকালে!"

"অত শত জানিনে! এই তোমার টিকেট রইল্‌! ছাখা হবে গার্ডেনেই। যথাসময়ে।" বলে' পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

মনে করিয়ে দিয়ে যায় দরজার কাছ থেকে—'হ্যাঁ, দামটাও নিয়ে যেয়ো সেই সঙ্গে, ভুলো না যেন।"

সবে মাত্র জলের কেটলিটা চাপাচ্ছি

গচ্ছিত ধন আর হস্তান্তরিত করবার ইচ্ছা হোলো না, বিপিনের অযাচিত বিক্রয়, ক্রিকেটের সীজন্-টিকেটখানা পকেটস্থ করে বেরিয়ে পড়লাম। বিপিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, গার্ডেনে, ঢোকবার মুখেই। যথাসময়েই।

নামকরা বিলিতি খেলোয়াড়রা সব এসেছিল সে-বছর। তারা অকস্মাৎ এসে পড়েছিল বোধ হয়! হাওয়া বদ্‌লাতে এবং ভারতবর্ষ কেমন তাই দেখতে ;—সেই সুযোগে, আমাদের চালাক্ লোকেরা, তাদের সঙ্গে ক্রিকেটের যোগাযোগ ঘটিয়ে একটা টেস্‌ট্ ম্যাচ্ বাধিয়ে বস্‌ল। এবং তারাও একচোট ক্রিকেট দেখিয়ে আর ভারতবর্ষকে দেখে নিয়ে চলে গেল।

ইডেন্ গার্ডেনের একটা অংশ ঘিরে, তার তিনধারে গ্যালারী খাড়া করা হয়েছে আর অন্য ধারটায় প্যাভিলিয়ন্। প্যাভিলিয়নের সীটগুলোর চড়া দাম, কিন্তু গ্যালারীর কড়া রোদ্ শিরোধার্য্য করবার শক্তি ছিল না বলে প্যাভিলিয়নেই আমরা গেলাম।

খুব আগ্রহের সঙ্গেই দেখছি ম্যাচ্। এরকম উৎসাহজনক খেলা আর হয়না,—সত্যিই! যে-দুজন বিলিতি ব্যাট্‌ধারী প্রথমে নেমেছেন, প্রায় দেড়ঘণ্টা হতে চল্‌ল, এখন পর্য্যন্ত তাঁরাই টিকে রয়েছেন। এই দেড় ঘণ্টায়, ওঁদের একজন আঠারো রাণ তুল্‌তে পেরেছেন, ওঁর সঙ্গীটি এ পর্য্যন্ত তেমন কিছু উচ্চ-বাচ্য করেননি—হয়রাণ্ হবার ভয়েই বোধ হয়।

খেলার মাঠে আমাদের জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য বিপিন কাল থেকে যে রকম ভাবিত হয়ে পড়েছিল তাতে আমারও ভাবনা কম হয়নি। কিন্তু এখন দেখছি, দুশ্চিন্তার তেমন কিছু ছিলনা—আমাদের আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখবার দায় অসঙ্কোচে

ও অকুতোভয়ে ওদের হাতেই তুলে দেওয়া যায়। আমাদের খেলোয়াড়রা মোটে না ব্যাট্ ধর্লেও চলে, ওদের ওপরেই আমরা নির্ভর করতে পারি, অনায়াসেই।

কী সাবধানতার সঙ্গে যে তাঁরা ব্যাটিং করছিলেন—ঠুক্ঠাক্—ঠুক্ঠাক্—ঠুক্ঠাক্! অধৈর্য্য কি অসহিষ্ণুতার লেশমাত্র নেই—তাড়াহুড়াও নেই একদম্। প্রথম শ্রেণীর প্লেয়াররাই ঠিক যে রকমটা পেরে থাকেন—ভালো ক্রিকেটারের দস্তুর যা। আমরাও এই রকমটাই প্রত্যাশা করেছিলাম। একেবারে হুবহু।

আরো তিন কোয়ার্টার কেটে গেল, রাণ্ উঠ্লো আরো চারটা। চা-র-টা!—চারচারটা! বাস্তবিক্, সূত্রপাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তিনদিন ব্যাপী এই খেলাটা কী জোর আর কী রোমাঞ্চকরই না হবে! একেবারে সীজন্ টিকেট কেটে অন্যায় কিছু করিনি। না, কিছু আর আফ্সোস্ হচ্ছে না সেজন্যে,—অনুশোচনা করার কিছু নেই সত্যিই! এহেন ক্রিকেট দেখার সৌভাগ্য কবার আসে জীবনে? সুতরাং পস্তাব কেন?

প্যাভিলিয়নের অর্দ্ধেক ততক্ষণে ফাঁক। দর্শকদের মধ্যে যারা একটু বয়স্ক, তাঁরা উত্তেজনার ধাক্কা আর সইতে না পেরে, চা-পানের চেষ্টায়, রেঁস্তরার দিক্টায় কেটে পড়েছেন। খালি সীটগুলি রেখে গেছেন, তাঁদের টুপি এবং ছাতার জিম্মায়—তারাই উন্মুক্ত সীট এবং নিজেদের, একাধারে, রক্ষণাবেক্ষণ করছে। বেশ বাহাদুরির সঙ্গেই করছে।

সেই দিকে বিপিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি : "চলো, আমরাও এই ফাঁকে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসি সরবৎ টরবৎ খেয়ে। রুমাল বেঁধে সিট রিজার্ভ করে' গেলেই হবে।"

"দূর্! এখুনিই তো জমলো খেলাটা, আরে উঠল দুটো রাণ্। ঐ তো ঐ সাহেবটা, এখন পর্য্যন্ত একটা টুঁ শব্দও করেনি,—এক্ষুণি, কটা ওভার্ বাউণ্ডারি করে' ফ্যালে, দ্যাখো না! ও কেবল তক্কে তক্কে আছে! বাবাঃ, কী খেলা একখান্!"

সার্টিফিকেট দিতে দিতে হিম্ সিম্ খেয়ে যায় বিপিন।

দেখি, ভালো করে চোখ পাকিয়েই তাকিয়ে দেখি। কিন্তু সেই একঘেয়ে•ঠুক্—ঠাক্—ঠুক্—ঠাক্—ঠুক্—ঠাক্! মিনিটের পর মিনিট সেই একান্ত ব্যাপার! কামারের এক ঘা আর আসে না; বোধ হয় কামার্ সুলভ কিছু নেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে।

অগত্যা, এদিকে ওদিকে তাকাই। যে দিকেই দক্পাত করি, হোম্রা চোম্রা লোকদের দেখতে পাই! হয় কোনো বড় ব্যারিষ্টার, নয় ডাক্তার, কি কোনো দেশনেতা, কিংবা নামজাদা কোনো সাহিত্যিক। দেশপ্রসিদ্ধ লোক সব, দেখলেই সন্দেহ হয়। মহাসমারোহে ছড়িয়ে আছে চার ধারেই।

"এধারে ওধারে দেখছ কী?" বিপিন আমাকে ধমক্ দ্যায়। "খেলা দেখতে এসেছো, খেলা দ্যাখো।"

"খেলা তো দেখছিই, সেই ফাঁকে বিখ্যাত লোকদেরও সব দেখে নিচ্ছি।" আমি বলি। "দেখতে দোষ আছে?"

"চেনো কাউকে ওদের ?"

আমি ঘাড় নাড়ি।

"তবে আর দেখে লাভ কি শুধু শুধু।" বলে বিপিন। "আমি ওদের সব্বাইকে চিনি। সব কিছু জানি ওদের। নাম ধাম, নাড়ি-নক্ষত্র। বলে' দিতেও পারি ঠিক ঠিক। ওদের সবার সঙ্গে আমার পরিচয়-সূত্র আছে।"

আমি বিস্ফারিত নেত্রে দেখি। এবার বিপিনকেই।

"রায় বাহাদুর রামহরি দাসকে জানো ? পাটের দালাল, ক্রোড় টাকার মালিক্ ?" বিপিন জিজ্ঞ্যেস্ করে।

"উঁ হু।"

"ঐ যে বসে আছে, ঐ কোণে। আমাদের দিকে পিঠ্ ফিরিয়ে।"

পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে' দেখা যায় না। দৃষ্টিই চলে না একদম্, তবু কলেবরের বিপুলতা থেকে, অপর পাঠে ওঁর চেহারাটা কেমন, অনেকখানি আন্দাজ করে নিলাম।

"সার্ শঙ্করণ্ নায়ারের নাম শুনেছ ?"

"না।" আমি সজোরই বলি—"কক্ষনো না।"

"ঐ যে, ঐ দাড়ি দুলিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন! ওধারটায়—"

"ওঃ! উনিই! উনিই সার্ শঙ্করণ! বটে!"

"উনি তাঁর দূর সম্পর্কের পিস্তুত ভাগ্‌নে শ্রীযুত দিগম্বরম্ পিলাই! গ্লাস্-ওয়ার্ মার্চ্চেন্ট্।"

"আর সার্ শঙ্করণ্? তিনি কোন্‌টা?"

"তিনি এখানে নেই। বোধ হয় মাদ্রাজে, তাঁর বাড়ীতেই এখন।" বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে।

অনেকক্ষণ যায়, বিপিন হঠাৎ প্রশ্ন করে আবার: ভবশঙ্কর রায়কে চেনো নিশ্চয়?"

দাড়ি দুলিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন

"না। ঘুণাক্ষরেও না।" দুঃখের সহিত বলি: "কে সে? করে কী?"

"আমিও জানিনে।" বলে বিপিন, "তবে ঐখেনে বসে আছে ঐ যে গালে হাত দিয়ে—!"

"ও!"

ভবশঙ্করকে নিরীক্ষণের চেষ্টা পাই, কিন্তু দূরবীক্ষণের অভাবে, সুবিধে করে উঠ্‌তে পারিনে।

অবশেষে, আমার জিজ্ঞাসার পালা আসে। অর্থাৎ, এসেছে বলে মনে করি। বিপিনের কাছে আমিই বা এত লজ্জিত আর খেলো হয়ে থাক্‌তে যাবো কেন? জেনারেল্ নলেজ্‌ আমারো যে কিছু কম নয়, জাগতিক আলাপ-পরিচয়ের ব্যাপারে আমিও যে খুব পিছিয়ে নই, অন্ততঃ বিপিনের চেয়ে, এটা ওকে জানানো দরকার।

"কর্ণেল্ গিদ্‌ওয়ানির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল কখনো? বিপিনকে জিজ্ঞেস্ করি। "চেনো ভদ্রলোককে?"

"না।" থতমত খায় বিপিন। "কোথায় তিনি?" আমি বলি: "পতাকার নীচেই যে বুড়ো লোকটি বসে আছেন তিনি হতে পারেন।"

"উনিই যে কর্ণেল্ গিদ্‌ওয়ানি কি করে বুঝলে?"

"ঠিক বুঝতে পারছিনে। তবে ঐরকম মনে হচ্ছে আমার।"

"কর্ণেল গিদ্‌ওয়ানির সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে?"

"উঁহু।"

"শুধুই কি মুখ-চেনা তবে?"

"তাই বা বলি কি করে!"

বিপিন ভারী বিরক্ত হয়। "তাহলে—তাহলে এর মধ্যে পরিচয়সূত্রটা কোন্‌খানে?"

"ভালো কথা", গিদ্‌ওয়ানি প্রসঙ্গটা আমি চাপা দিতে চাই—"মহারাজার খবর কি?"

"কোন্ মহারাজা ?"

"যে কোনো মহারাজা।"

"ও !" এরপর বিপিন, একেবারেই চুপ্ মেরে যায়। অকস্মাৎ ভারী বিমুখ হয়ে পড়ে আমার প্রতি। কি কারণে জানিনা।

অনেকক্ষণ পরে আবার সে 'থাতিয়ে' ওঠে, আমাকে পাশে টেনে নিয়ে কাণের কাছে কী ফিস্ ফিস্ করে।

"কী—কী বল্লে ?"

"শ্ শ্—শ্ শ্ !" যদ্দুর সম্ভব গলা নামিয়ে সে বলে, "পিছন দিকে তাকিয়ো না ! খবরদার !"

"কেন ? কেন ?"

"একটা লোক বসে আছে।" বিপিন বলে চাপা গলায়— "ইস্কুলে পড়্ত আমার সঙ্গে।" বিপিনের গলার স্বর পৃথিবীর মত উত্তর দক্ষিণে চাপা।

"বলো কি !" আমি বলি। "বুঝ্ছি আমি, হ্যাঁ"—ওকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাই : "বুঝ্তে পারছি সব !"

বাস্তবিক, বুঝতে পারা খুব কষ্টকর নয়। ফুট্বলের আর ক্রিকেটের মাঠে এত সব পুরণো আলাপীর সঙ্গে এমন অনিবার্য্যরূপে আর আচম্বিতে দেখা-সাক্ষাৎ ঘট্তে থাকে যে, জীবন ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার বলেই ধারণা হয়। তার ওপরে ছেলেবেলার আলাপী হলে তো আর কথাই নেই !

যারা এতদিন বেঁচে আছে বলে' কখনো আশঙ্কা করিনি, যাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলে মেরে দিয়েছি, তারাই অযাচিত ভাবে এসে আবির্ভূত হতে থাকে, আর এত বাজে বক্‌তে হয় তাদের সঙ্গে! বয়স বেড়ে গেলে, ইস্কুলের সহপাঠির মতো বিরক্তিকর আর কিছুই নেই! এরাই ইস্কুলে পড়েছে একদিন, আমার সঙ্গেই পড়েছে, তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একথা বিশ্বাস করাই কঠিন। তাদের সে কচি মুখ নেই আর, কী রকম বুড়িয়ে গেছে, বিশ্রী হয়ে গেছে,—কেমন যেন্ বদ্‌লে গেছে সব দিকেই। অতএব, ছেলেবেলার পরিচয়-সূত্রের জের্ টান্‌তে, বিপিন কেন নারাজ, টের পেতে আমার দেরি হয় না।

এমন সময়ে লাঞ্চের ইন্‌টারভ্যাল্ এসে পড়ে। আমি আর বিপিন মাঠের পীচ্ পরীক্ষার জন্যে উঠে পড়ি। অর্থাৎ আর সকলেই উঠে পড়েছিল, আমরা তাদের সহযোগী হই কেবল। অত্যন্ত সন্তর্পণে পীচ্ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছি, এমন সময়ে এক দাড়িওলা ভদ্রলোক, যেন মাটিফুঁড়েই আবির্ভূত হয় আমাদের সাম্‌নে। একেবারে বিপিনের মুখোমুখি বল্‌তে গেলে।

"ভালো, ভালো, ভালো!" তাঁর ভগ্ন কণ্ঠ অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: "বিপিন নয় আমাদের? বিপিন সর্ব্বাধিকারী?"

প্রশ্নটা নিতান্তই অধিকন্তু বলে' আমি মনে করি। এ যদি বিপিন না হয় তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ, যা হওয়া এর পক্ষে

একরকম প্রায় অসম্ভবই এই জীবনে। এরকম অদ্ভুত জিজ্ঞাসার মানে ?

"ভালো—ভালো—ভালো'! বিপিন না আমাদের

"তুমি চিন্‌তে পারছ না আমাকে—য়্যঁা ?" ভদ্রলোকের দাড়ি বিচলিত হয়ে উড়তে থাকে বাতাসে।

"আজ্ঞে, না তো।" একটু কঠোর স্বরেই বিপিন জবাব ছায়।

"আশ্চর্য্য! বাগ্‌নান্ হাইস্কুলে পড়তাম আমরা। ইস্কুলে পড়্‌তে মনে নেই, আমরা কতবার যে আর্সোলা শিকারে বেরিয়েছি? হাত ধরে টানাটানি করে নিয়ে যেতে আমায় মনে, পড়ে না তোমার? আর্সোলা ধরতে কী যে ভালোবাসতে তুমি! তোমার সাধাসাধির দৃশ্য এখনো যে ভাসছে আমার চোখের ওপর!"

"বাগ্‌নান্ হাইস্কুলে পড়িনি আমি কক্ষণো, কোথায় যে বাগ্‌নান্ তাই জানিনা!" বিপিন ঘোরতর প্রতিবাদ করে: "আর আর্সোলা? আর্সোলা আমার দুচক্ষের বিষ!"

"কিন্তু—" ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বুলান্।

"তা ছাড়া বিপিন আমার নামই নয়।" এবার সে অত্যন্ত নির্দ্দয় হয়ে ওঠে: "আমার নাম ভেঙ্কট্‌রাম্ বেঙ্কটপ্পা! বাঙালার মতো দেখতে হলে কি হবে, আসলে আমি মাদ্রাজী। বাংলা দেশে আছি বহুৎ দিন, তাই ভালো বাংলা বল্‌তে পারি। অনায়াসেই পারি।"

"য়্যঁা—" ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়েন এবার।

"আজ্ঞে, ঠিকই বল্‌ছি। সার্ শঙ্করণ্ নায়ারের নাম শুনেছেন? তাঁর পিস্তুত ভাগ্‌নে শ্রীযুত দিগম্বরম্ পিলাই? আমার মামা তিনি।"

আমিও সায় দিই : "এবং কর্ণেল্ গিদ্‌ওয়ানি এঁর মাস্তুতো ভাই।" যোগ করে দিই সেই সঙ্গে।

ভদ্রলোক, এর পরে, আর দাঁড়ানো বাহুল্যমাত্র বিবেচনা করেন। অপ্রস্তুত হয়ে চলে যান্ অন্য দিকে। অন্য কোনো বাল্যবন্ধুর অন্বেষণেই, হয়তো।

আর্সেলার জন্যে সেই হাত ধরে সাধাসাধি

ওঁর অন্তর্দ্ধানের পর বিপিনকে আমি বলি : "এটা কি ভালো হোলো ? ঈষৎ অভদ্রতা হোলো না ? হাজার হোক্ ছেলেবেলার—"

"সর্ব্বনাশ করেছে!" বাধা দিয়ে বলে বিপিন: "পালিয়ে এস চট্‌পট্, ঐ আরেকজন—!"

বিপিন আমাকে টেনে নিয়ে সরে পড়তেই চেয়েছিল। কিন্তু আসন্ন ব্যক্তিটি অমন তীর বেগে অগ্রসর হচ্ছিলেন, যে আমাদের সম্মুখীন হতে তাঁর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। পলায়নের সমুদয় চেষ্টাই বিফল হয় বিপিনের।

এবং ঠিক এই মুহূর্ত্তে ওয়ার্নিং বেল্ বেজে ওঠে। মাঠ ছেড়ে যাবার প্রথম ঘণ্টা। চার ধার থেকে হুদ্দাড় করে সবাই ছুটতে থাকে, নিজের নিজের বসবার জায়গায়। এবং মাঠের পরিচারকরা, প্রায় আধ ডজনটাক্ সংখ্যায়, প্রকাণ্ড এক রোলার্ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সবেগে, খোলার পীচ্ দুরস্ত করবার দুরন্ত লালসায়। রোলার্‌টাও ঝোঁকের মাথায় গড়িয়ে আসতে থাকে আমাদের দিকেই। দুর্দ্দমনীয় রূপে।

"ভালো, ভালো ভালো! আমাদের বিপিন না—?"

এই বলে' বিপিনের পরিচয়-সূত্র করমর্দ্দনের জন্ম যেমন না হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, বিপিন তাঁকে নামমাত্র গ্রহণ করে' সামান্ম মাত্র ঠেলে দিয়েছে পিছনের দিকে। এমন কিছু কাণ্ড না, কিন্তু এদিকে বিপিনের ছাতার বঁড়শীর মত বাঁট্‌টা কেমন করে' বলা কঠিন সেই পরিচয়সূত্রের গোড়ালিতে গিয়ে আট্‌কে যায়। একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে! তার ফলে, তিনি টাল্ সামলাতে না পেরে, চিৎপাৎ হয়ে পড়েন তৎক্ষণাৎ। সেই পীচের ওপরেই!

এবং সঙ্গে সাঙ্গ—

সেই বিশ্‌মনী রোলার্‌, যা তাঁর পিছনে পিছনেই প্রায় ধাওয়া করে' আস্‌ছিল, সটান্‌ এসে পড়ে তাঁর ওপরে।

পরিচয়সূত্র শুধু ছিন্ন নয়, একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হবার দাখিল !

এই যে বিপিন যে—!

প্রায় বারোজন পরিচারক এবং পার্শ্ববর্ত্তী মিলেও রোলার্‌কে থামাতে পারে না, পরিস্কার ভদ্রলোকের ওপর দিয়ে চলে যায়—অত্যন্ত অভদ্রভাবেই, তাঁকে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে' দিয়ে। উঃ আঃ কর্‌তে ছ্যায় না :পর্য্যন্ত !

সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে, ডাক্তার এসে পড়ে, ফাস্‌ট্‌ এড্‌ দেওয়া হয়। নাঃ, মারা যান্‌নি একেবারে, মারা যাবার ভয়ও

নেই, তবে, রোলারের বশীভূত হওয়ার জন্যে, পাক্কা ছ'মাসের ধাক্কা!

বহুদিন বাদে বিপিনের সঙ্গে দেখা আবার। খেলার মাঠে নয়, চল্‌তি পথে।

"এই যে, বিপিন যে! অনেকদিন পরে!" আমি বলি। সহাস্য-মুখেই বলি।

"বাঃ, নরেন কোত্থেকে হঠাৎ?" বলে বিপিন: "কদ্দিন পরে দেখা হোলো!"

"এক যুগ—!" আমার নিশ্বাস দীর্ঘতর হয়।

"কী করছিলে য়্যাদ্দিন্‌?" জিজ্ঞাসা করে বিপিন!

"কী আর করবো!" জবাব দিই আমি: "তারপর, তোমার খবর কি, চল্‌ছে কেমন?"

"এই চলে যাচ্ছে—" বিপিন তার ছাতাটাকে ডান্‌হাতে বদ্‌লি করে। "চলে যাচ্ছে কোনরকমে।"

শলা-বাঁকানো ছাতিটাকে দেখি। সেই সঙ্গে, সেই মুহূর্তেই, রোলার্‌-টোলার্‌ কিছু তাড়া করে' আস্‌ছে কিনা, পিছন ফিরে' দেখে নিই চট্‌ করে'।

"যাক্‌, ভালো তো সব। তাহলেই হোলো।"

এই বলে' বিদায় নিয়ে, চট্‌পট্‌ চম্পট্‌ দিই।

বিপিনও হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচে।

এবং আমিও।